ভারতের বনজ

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : প্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

পরবর্তী বর্ষে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভারতের বনজ

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

এই বইয়ে মুদ্রিত চিত্রাবলী দেরাহুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিট্যুট-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। আমার কন্যা শিউলি বইয়ের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি করে ও অন্য নানা রকমে সাহায্য করেছেন।—লেখক

প্রকাশ ১৩৫১

পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৬ কার্তিক

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

২.১+২.১



শাল অরণ্য। গোরুমারা। জলপাইগুড়ি
আর. এস. ট্রুপ গৃহীত ফটোগ্রাফ



দেওদার অরণ্য। জউনসর। যুক্তপ্রদেশ
বি. ও. কভেণ্টি গৃহীত ফটোগ্রাফ

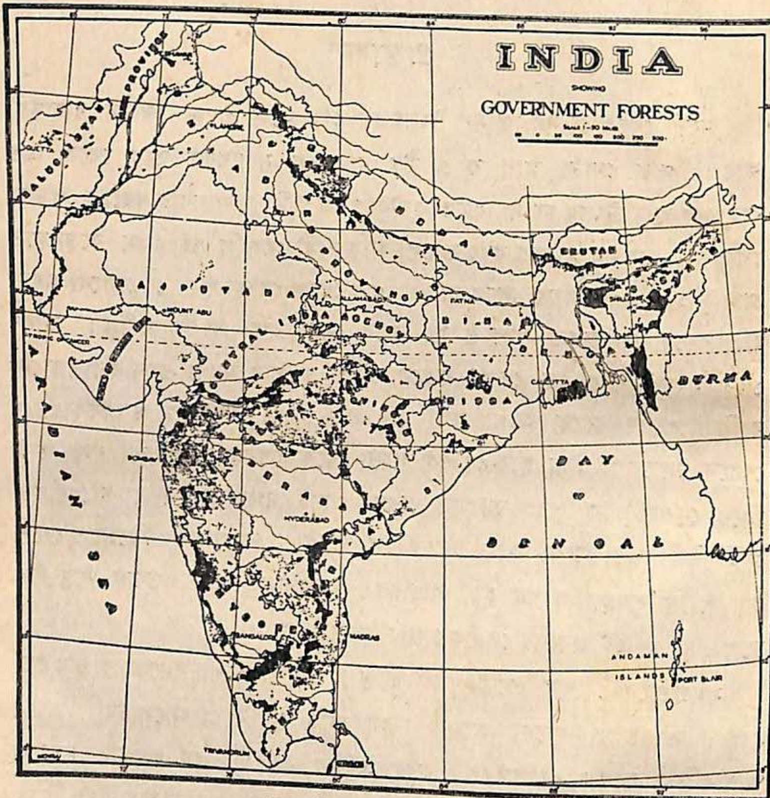
প্রস্তাবনা

অরণ্য থেকে যে সব জিনিস উৎপন্ন হয় তার মধ্যে প্রধান জিনিস বাহাদুরী কাঠ। গাছ মোটা আর কাণ্ড উঁচু না হলে সাধারণত তার থেকে এত বাহাদুরী কাঠ উৎপন্ন হয় না, যাতে কাটবার আর নিয়ে আসবার খরচের পড়তা পোষায়। যে সব গাছের কাঠ ভালো আর দামী সেগুলি ওই রকম বড়ো হতে প্রায়ই ১৫০।২০০ বছর লেগে যায়। এর থেকে বোঝা যাবে যে কোনো অরণ্য যদি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় তবে সেটা রক্ষা পাওয়া কঠিন। কারণ ১৫০ বৎসর পরে কে ভোগ করবে, সেই আশায় অরণ্য রক্ষা করা কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছে আশা করা যায় না। বরং অরণ্যের স্বত্বাধিকারী যে কোনো লোকেরই ইচ্ছা হবে যে ওই অরণ্য থেকে এখনই যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নেওয়া যাক এবং তারপর অরণ্য কেটে নগর বসানো বা চাষের জন্য জমি বিলি করা যাক, কারণ চাষের ফল শীঘ্রই পাওয়া যায়। বিশেষত দেশে যত শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন হয়, সাধারণত অরণ্যের ধ্বংসও ততই শীঘ্র শীঘ্র চলে ; কারণ এই অবস্থায় লোকের চাষবাস বৃদ্ধি পায়।

সমগ্রভাবে দেশের এতে খুবই ক্ষতি। এতে দেশের বনজের অভাব তো হয়ই ; তা ছাড়া আরো অনেক রকম ক্ষতি হয় যার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেবল এইটুকু বলা যায় যে দামোদর নদীতে যে মধ্যে মধ্যে ভীষণ বন্যা হয় তার একমাত্র কারণ দামোদরের উৎপত্তিস্থল ছোটো নাগপুর অঞ্চলের অরণ্যের ধ্বংস।

কাজেই সমগ্রভাবে দেশের লোকের ভালোর জন্যে দেশের অরণ্য-সম্পত্তি রক্ষা করা দরকার আর এই দায়িত্ব সব দেশেই প্রধানত রাজশক্তির (State)।

ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যগুলি বাদ দিলে ইংরেজ-শাসিত ভারতের আয়তন মোটামুটি ৮,৫০,০০০ বর্গমাইল। এর মধ্যে সরকারি অরণ্যের পরিমাণ ১,০০,০০০ বর্গমাইল, অর্থাৎ সাড়ে আট ভাগের এক ভাগ।



ভারতবর্ষে সরকারী অরণ্যের সংস্থান

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও অনেকগুলিতেই কিছু কিছু সরকারী অরণ্য আছে। এ ছাড়া বেসরকারী অরণ্যও কিছু কিছু আছে। এসবের পরিমাণ ঠিক জানবার উপায় নেই।

এক সময় ভারতের প্রায় সর্বত্রই অরণ্য ছিল। রামায়ণ, মহাভারত পড়লে মনে হয় যে, সে সময়ে মানুষের বসতির চেয়ে বোধ হয় অরণ্যই বেশী ছিল বা দুই-ই সমান ছিল।

"দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ বিরাট
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাঞ্চী উদ্ধত ললাট…
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।"

নৈসর্গিক প্রকৃতি ও মানুষ এ-দুইয়ের পক্ষেই এই রকম ব্যবস্থাই সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু ক্রমশ বসতি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের ধ্বংসও হচ্ছিল, তার প্রমাণ খাণ্ডবদাহন। ব্রিটিশ শাসনে সমস্ত দেশে অনেকদিন শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন হওয়া অরণ্যের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে। মুঘল বাদশাহেরা যে অরণ্যে বাঘ-ভাল্লুক শিকার করতেন এখন তার অনেক জায়গা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। তবে প্রায় একশ বছর থেকে অরণ্য-সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ হওয়ায় যত অরণ্য ধ্বংস হতে পারত, তা হয়নি। যাই হোক এখন দেশে যে অরণ্য অবশিষ্ট আছে তার মোটামুটি সংস্থান এইরূপ :

(১) উত্তর অরণ্য— উত্তর দিকে একরাজি অরণ্য উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে হিমালয় ও হিমালয়ের তরাই অঞ্চল ধরে পাঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশের মধ্যে দিয়ে গোরখপুর থেকে নেপালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তারপর দার্জিলিঙের কাছে নেপাল থেকে বেরিয়ে জলপাইগুড়ির মধ্যে দিয়ে আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত আর পূর্ব সীমান্ত ধরে দক্ষিণে চট্টগ্রামের ভেতর দিয়ে বর্মায় চলে গিয়েছে।

এই উত্তর অরণ্যের দক্ষিণে, আর্যাবর্তে আর অরণ্য বেশী অবশিষ্ট নেই, কেবল চট্টগ্রামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে, গারো আর খাসিয়া পাহাড়ে, আর সুন্দরবনে খুব বড়ো বড়ো অরণ্য আছে।

(২) হিমালয়ের অরণ্যরাজির দক্ষিণে গঙ্গার সমতলে কোনো অরণ্য নেই। আবার বিস্তৃত অরণ্য পাওয়া যায় মধ্য-প্রদেশে। এই মধ্য অরণ্যরাজি পশ্চিমে সুরাট থেকে আরম্ভ করে সাতপুরা পর্বত আর মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়ে একদিকে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছে আর একদিকে সুন্দরবন পর্যন্ত এসেছে।

(৩) তৃতীয় অরণ্যরাজি পশ্চিম উপকূলে। এটা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থানা জেলায় আরম্ভ হয়ে পশ্চিমঘাট ধরে কতকটা ছাড়া ছাড়া ভাবে কানারা, মালাবার, নীলগিরি ও আনামালাই পর্বত ধরে ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তে পৌছেছে। কোনো কোনো জায়গায় এই অরণ্যরাজি সমুদ্রতট থেকে দেশের অনেকটা ভিতর পর্যন্তও ঢুকে পড়েছে।

(৪) পূর্ব উপকূলে কতকগুলি অরণ্য উত্তরে গঞ্জাম ও ভিজাগাপটম্ থেকে আরম্ভ করে ভিতরে করনুল ও দক্ষিণে নেল্লোর ও সালেমের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ মাদ্রাজে পূর্বোক্ত অরণ্যরাজির সঙ্গে মিশেছে।

ব্রিটিশ ভারতে সরকারী অরণ্যের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯

প্রদেশ		অরণ্যের পরিমাণ (বর্গমাইল)				প্রদেশের আয়তনের তুলনায় শতকরা
নাম	প্রদেশের আয়তন (বর্গমাইল)	সংরক্ষিত (Reserve forest)	আশ্রিত Protected forest)	অন্য	মোট	
বাংলা	৭৮,৭০৮	৬,৩৩৫	৯৮৬	৪,৯৩৪	১২,২৫৫	১৫·৬
যুক্তপ্রদেশ	১,০৬,২৪৮	৫,২২৪	৫৩৮	৪১১	৬,১৭৩	৫·৮
পাঞ্জাব	৯৬,৮৩০	২,০২৯	৩,২০৭	৪৪৮	৫,৬৮৪	৫·৯
বিহার	৬৯,৩৪৮	১৩১০	৬৬২	১	১৯৭৩	২·৮
উড়িষ্যা	৩২,৩৯৮	১৪০২	৭১৬	১	২১১৯	৬ ৫
আসাম	৫৫,৪৪৫	৬৫১৪	—	১৪,৫৫৭	২১০৭১	৩৮
মধ্যপ্রদেশ	৯৮,৫৭৩	১৯,৪৩২	—	—	১৯৪৩২	১৯·৭
কুর্গ	১;৫৮২	৫১৮	—	—	৫১৮	৩২·৭
উঃ পঃ সীমান্ত	১৩,০৯৯	২৬৬	—	১২	২৭৮	২·১
আজমীর	২,৩৬৭	৭৩	—	—	৭৩	৩ ০৮
বালুচীস্থান	৪৬,৯৭৪	৩৪১	—	৪৭২	৮১৩	১·৭
মাদ্রাজ	১,২৫,১৬৩	১৫,২৪৮	১৮৬	৩,২৪৯	১৮,৬৮৩	১৪·৯
বোম্বাই	৭৬,০২৬	১০,৫৬৯	১৬০	—	১০,৭২৯	১৪·১
সিন্ধু	৪৭,১৫৫	১,০৭৮	৭৭	—	১,১৫৫	২·৪
মোট	৮,৪৯,৯১৬	৭০,৩৩৯	৬,৫৩২	২৪,০৮৫	১,০০,৯৫৬	১১·৯

ব্রিটিশ ভারতে বে-সরকারী অরণ্যও যে নেই তা নয়। তবে তার পরিমাণের অঙ্ক নির্ভুলভাবে পাওয়া অসম্ভব।

এছাড়া দেশীয় রাজ্যেও, বিশেষত মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কুরেও, অনেক সংরক্ষিত অরণ্য আছে।

অরণ্যের প্রকৃতির ভেদের কারণ

ভৌগোলিক অবস্থান এবং মাটি আর আবহাওয়ার বিভিন্নতার জন্যে অরণ্যের প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। মাটির প্রকৃতি নির্ভর করে প্রধানত ভূপৃষ্ঠের যে-জাতীয় পাথর থেকে মাটি উৎপন্ন হয়েছে তার উপর, আর জায়গাটা পার্বত্য বা সমতল এর ওপর। আবহাওয়ার মধ্যে প্রধানত বৃষ্টিপাত আর বাতাসের তাপের বিভিন্নতায় অরণ্যের ভেদ হয়ে থাকে। অবশ্য মানুষের কর্তৃত্বেও অরণ্যের প্রকার কিছু বদল হতে পারে কিন্তু এটাও অনেকটা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে Cryptomeria japonica নামক সরল গোত্রের একটি জাপানী গাছ এদেশে দার্জিলিং জেলায় সহজেই উৎপাদন করা যায়, কারণ জাপান ও দার্জিলিঙের আবহাওয়া অনেকটা এক রকম। তবে ওই গাছ কলিকাতায় বা ১০ হাজার ফুট উঁচু পর্বতের উপর লাগালে বাঁচাবার সম্ভাবনা নেই।

আমাদের ভূপ্রকৃতি

ভারতের হিমালয় পর্বতশ্রেণী পূর্বে আসামের ব্রহ্মপুত্র থেকে আরম্ভ করে খানিকটা সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে গোরখপুরের কাছ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে কাশ্মীর ও আফগানিস্থানে চলে গিয়েছে। এই পর্বতরাজি ১৮০০০-২০০০০ ফুট উঁচু। যতই উঁচুতে ওঠা যায় ততই বাতাস ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এই জন্যে এর প্রতি ২।৩ হাজার ফুট উচ্চতার প্রভেদে অরণ্যেরও প্রকৃতিভেদ হয়।

পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র যেখান থেকে পর্বত থেকে বেরিয়েছে সেই জায়গা থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে আর-এক শ্রেণীর পর্বত মণিপুর, লুসাই ও খাসিয়া পর্বত ধরে চট্টগ্রামের মধ্যে চলে গিয়েছে।

হিমালয়ের দক্ষিণে গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর সমতল, পশ্চিম থেকে পূর্বে আন্দাজ

১৬০০ মাইল বিস্তীর্ণ—দিল্লির দক্ষিণে থর বা রাজপুতানার মরুভূমি দিয়ে এ সমতল দুই ভাগে বিভক্ত।

এই সমতলের দক্ষিণে একটা মালভূমি আছে। তার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি ৩০০০ থেকে ৫০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু পর্বত আছে। এর মধ্যে নর্মদার উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত আছে আর নর্মদা ও তাপ্তির মধ্যে সাতপুরা ও মহাদেও পর্বতশ্রেণী পূর্ব দিকে মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়ে ছোটো নাগপুর পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

তাপ্তী আর মহানদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। এর পশ্চিমে বোম্বাই ও মালাবার উপকূলে পশ্চিম ঘাট উত্তরে ২০০০ থেকে ৪০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু, আর দক্ষিণে নীলগিরিতে ৮৫০০ ফুট উঁচু। পশ্চিম ঘাট থেকে পূর্বে ভূমি ক্রমশ অবনত হয়ে পূর্বঘাটের ছোটো ছোটো পাহাড় ভেদ করে বঙ্গোপসাগরে নেমে গিয়েছে।

বৃষ্টিপাত

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অসংখ্য রকম। সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় (১) পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই থেকে কোচীন পর্যন্ত, (২) দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারে, (৩) আসামের গারো ও খাসিয়া পর্বতে, (৪) চট্টগ্রামে। এই সব জায়গার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০″ থেকে ২০০″ ইঞ্চি বা আরো বেশী। এর মধ্যে চেরাপুঞ্জিতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত গড়ে ৪৬০″ ইঞ্চি। (১৮৬১সালে নাকি ৯০৫″ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়েছিল।) দক্ষিণে পশ্চিমঘাটের পূর্বে বৃষ্টি কম। দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে ২০″ থেকে ৩০″ ইঞ্চির বেশী নয়। উত্তরে আর পূর্বে গঙ্গানদীর সমতল, আসাম, বিহার, উড়িষ্যায় বাৎসরিক ৫০″ থেকে ১০০″ পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। পশ্চিমে গান্ধার ও রাজপুতানায় জায়গায় জায়গায় মোটে ৫″ থেকে ২০″ ইঞ্চি। সিন্ধু নদীর ধারে ধারে কোথায় কোথায়ও বৎসরে ৫″ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টি হয়।

এ ছাড়া মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক জায়গায় বছরে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে যখন বৃষ্টি বেশী হয় আর অন্য সময় বৃষ্টি খুব কম হয়। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে কাতিক মাস পর্যন্ত বৃষ্টির আশা করা যায়।

বাতাসের তাপ

বাতাসের তাপ সম্বন্ধে বলা যায় যে, শীতকালে দক্ষিণ থেকে যতই উত্তরে যাওয়া যায় ততই ঠাণ্ডা বেশী। কিন্তু গ্রীষ্মকালে পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে, বাংলা ও আসামে গরম অপেক্ষাকৃত কম আর সমুদ্রতীর থেকে যতই দেশের ভিতরে প্রবেশ করা যায় ততই গরম বেশী। অবশ্য পর্বতে এর ব্যতিক্রম হয়। সেখানে যতই উপরে উঠা যায় ততই শীত বেশী।

ভারতবর্ষের অরণ্যের প্রকারভেদ

ভারতের অরণ্যগুলির বিবরণ খুব মোটামুটি ভাবে ৭ অংশে দেওয়া যেতে পারে। যথা—

(১) পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য।

(২) পূর্ব হিমালয়ের অরণ্য।

(৩) সাল অরণ্য।

(৪) চট্টগ্রামের অরণ্য।

(৫) জোয়ারের অরণ্য।

(৬) পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধুদেশের অরণ্য।

(৭) গঙ্গার দক্ষিণে পত্রমোচী অরণ্য।

এই সমস্ত অরণ্যের বিবরণ দেওয়ার আগে বাংলাদেশের অরণ্যসংস্থানের বিষয় সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভালো। এখানে "বাংলাদেশ" বলতে এখন বাংলা গভর্নরের অধীনে যে প্রদেশ আছে তাই বুঝতে হবে।

মধ্য বাংলায় কোনো অরণ্য অবশিষ্ট নেই। বাংলাদেশের অরণ্য প্রধানত দেশের তিন প্রান্তে আছে: (১) উত্তর সীমান্তে—দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়, (২) দক্ষিণ সীমান্তে—সুন্দরবনে, (৩) দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে—চট্টগ্রামে। এ সব স্থানই অপেক্ষাকৃত দুর্গম।

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির অরণ্য উপরে লিখিত "পূর্ব হিমালয়" ও "সাল" অরণ্যের অন্তর্গত। সুন্দরবনের অরণ্য জোয়ারের অরণ্যের মধ্যে গণ্য। আর চট্টগ্রামের অরণ্য এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলে ধরা হয়েছে। এ সবই সরকারী অরণ্য। এ ছাড়া কিছু কিছু বেসরকারী অরণ্য পূর্বে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় আর পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় আছে। এগুলিও "সাল অরণ্য" তবে বড়ো আকারের সালগাছ আর এখানে অবশিষ্ট নেই।

ভারতের অরণ্যের যে সাত প্রকার ভাগ হল তার মোটামুটি বিবরণ এইবার দেব। কিন্তু তার আগে বলে রাখা দরকার যে, এই ভাগ Logical Division (ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী ভাগ) নয়। অর্থাৎ অনেক সময়ে একরকম অরণ্য, যেমন সাল অরণ্য, ক্রমশ ক্রমশ দু-একটি করে গাছ বদলাতে বদলাতে অন্য জাতীয় অরণ্য, যেমন পূর্ব হিমালয়ের অরণ্যে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া অনেক গাছ আছে যা দু-তিন রকম অরণ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন শিমুলগাছ। এটি এক জোয়ারের অরণ্য আর হিমালয়ের ৫০০০´ ফুটের চেয়ে বেশী উঁচু অরণ্যে পাওয়া যায় না, তাছাড়া আর সর্বত্র অল্পবিস্তর আছে।

পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য

এ অরণ্য প্রধানত সরল বর্গীয় গাছের অরণ্য, যদিও অনেক রকম অন্য জাতীয় গাছও আছে। এ অরণ্যের প্রধান গাছ দেওদার (Cedrus libani) এটি স্বজাতিসঙ্গপ্রিয় (gregarious) গাছ। তবে এর সঙ্গে অনেক জায়গায় অল্প বিস্তর স্প্রুস (Picea Morinda) চিল্‌পাইন (Pinus excelsa) এক রকম সাইপ্রেস্ (Cupressus torulosa) এবং কোথায় কোথায়ও silver fir (Abies Pindrow) এই সব সরল বর্গীয় গাছ থাকে। তাছাড়া তিন রকমের ওক্‌গাছ, একরকম রোডোডেন্‌ড্রন ও অন্যান্য চেপটা পাতার গাছও কিছু কিছু আছে। দেওদার অরণ্যের নীচে চির্‌পাইন (Pinus longifolia) নামক একরকম স্বজাতিসঙ্গপ্রিয় পাইন অনেক জায়গায় অরণ্য করে থাকে। তার নীচে অনেক রকম লরেল বর্গীয় গাছ, শিরিষ, টুন, কাঞ্চন ইত্যাদির জঙ্গল আছে।

পূর্ব হিমালয়

নেপাল থেকে পূর্বে দেওদারের অরণ্য নেই। দার্জিলিং জেলায় ১২০০০ ফুটের উপরে অরণ্য জন্মে না, সেখানে ঘাস চরাবার স্থান। ৯০০০ থেকে ১১০০০ ফুট উঁচুতে প্রধান গাছ silver fir (Abies Pindrow)। এও

একটা স্বজাতিসঙ্গপ্রিয় সরল বর্গীয় গাছ। এর ফাঁকে ফাঁকে অনেক জায়গায় অনেক রকমের রোডোডেনড্রন্ জাতীয় গাছের অরণ্য আছে। (পশ্চিমে কেবল একরকম রোডোডেনড্রন পাওয়া যায়, তাও বেশী নয়।) আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সান্দাকৃফু পর্বতে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা দেখে থাকবেন নানা জাতীয় রোডোডেনড্রন-অরণ্যের গোলাপী, লাল, নীল ইত্যাদি গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে পর্বতের কি শোভা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে বা একটু নীচে ইউট্রি (Taxus baccata) ও বিশেষত এক রকম বিশালাকার স্প্রুস (Tsuga brunoniana) এই দু রকম সরল বর্গীয় গাছ আর তিন-চার রকম ওকগাছ (Quercus lamellosa, Q. lineata, Q. pachyphylla) আছে। আরো নীচে লাল চাঁপ, ও সফেদ্ চাঁপ, চেস্টনাট (কাটুস), লালি কাওলা ও অন্যান্য অনেক লরেল বর্গীয় গাছ, পিপ্লি (Bucklandia populnea) ইত্যাদি। ৩৫০০০ ফুটের নীচে টুন, শিরিষ, পাখাসাজ, শিমুল, চিলাউনি (Schima Wallichii) চাঁপা, চিকরাসী, একরকম বাঁশ (Dendrocalamus Hamiltonii) ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ সবই সমতল ভূমিতেও আছে। কোথায় কোথায়ও সালগাছও আছে। সমতল ভূমিতে নেমে এলে এ অরণ্য অনেক জায়গায় সাল অরণ্যের সঙ্গে মিশে যায়। সালগাছ ৩০০০।৩৫০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত জন্মে। কোথাও কোথাও বা নদীর চড়ায় কেবল খয়ের, সিসু, শিমুল, শিরিষের গাছ আছে।

সাল অরণ্য

ভারতের সাল অরণ্য দুই সারে আছে। এক সার হিমালয়ের দক্ষিণে ডেরাডুন অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে গাড়োয়াল, কুমায়ুন, অযোধ্যা, নেপাল, বাংলা তরাই, জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স, গোয়ালপাড়া হয়ে গারো পাহাড় পর্যন্ত গিয়েছে। আর এক সার মধ্যপ্রদেশে বালাঘাট থেকে আরম্ভ করে ছাড়াছাড়ি ভাবে পূর্বে সিংভূম, উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, আবার খানিকটা ছেড়ে

মধুপুর জঙ্গল (ময়মনসিংহ) পর্যন্ত পৌঁছেছে—আর দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত গিয়েছে।

সাল অরণ্য সব এক রকম নয়। কোথায় কোথায় কেবল সালগাছেরই অরণ্য। কোথায় কোথায়ও বা তার সঙ্গে নানাজাতীয় অন্য গাছও আছে।

চট্টগ্রামের অরণ্য

চট্টগ্রামের অরণ্য অনেকটা বিশিষ্ট শ্রেণীর। এর প্রধান গাছগুলি খুব উঁচু হয়। এমন কি পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো কোনো অরণ্যের উচ্চতা গড়ে ২০০ ফুট পর্যন্ত আছে। এ সব অরণ্যের প্রধান গাছ গর্জন (Dipterocarpus Spp) সিভিট (Swintonia floribunda) চাপালিষ্ট, জারুল, নাগেশ্বর, অশোক, নানাজাতীয় ওক, টুন, জিওল, জাম, লরেল বর্গীয় গাছ, অনেক রকম পাম এবং বেত ও প্রচুর মুলী নামক বাঁশ।

জোয়ারের অরণ্য

সুন্দরবনে আর-এক বিশেষ শ্রেণীর অরণ্য দেখা যায়। এ অরণ্যে প্রচুর কাদা। জোয়ারের সময়ে অরণ্যের মধ্যে জল দাঁড়ায়, ভাঁটার সময়ে সরে যায়। সাধারণ গাছ এ অবস্থায় বাঁচতে পারে না। কেওড়া নামক এক রকম বড়ো গাছ এখানে নদীর ধারে ধারে হয়। তাছাড়া সুন্দরবনের অন্য গাছ আকারে অপেক্ষাকৃত ছোটো, প্রধান গাছ পূর্বে সুঁদরী, পশ্চিমে গরান্ সঙ্গে সঙ্গে হিন্তাল নামক খেজুরজাতীয় এক রকম গাছ, গেঁওয়া (Excæcaria Agallocha) ইত্যাদি। সুন্দরবনের পরিমাণ কম নয় কিন্তু অরণ্যে গাছের রকমারী খুব কম। তার ফলে স্বাভাবিক দৃশ্য অনেকটা একঘেয়ে।

পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু

এখানকার গাছ প্রায় সবই ছোটো ছোটো বাবলা। সঙ্গে কুলজাতীয় ও অন্য অন্য দু-চার রকম গাছ হয়।

দাক্ষিণাত্যের অরণ্য

মধ্য ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতের সীমা পর্যন্ত অরণ্য অনেকটা এক রকমের। এখানে পত্রমোচী গাছই বেশী। কিছু সেগুনগাছ সব জায়গায়ই আছে। তাছাড়া ধাওরা (Anogeissus latifolia), সাল, বিজাসাল, সন্দন, কেলিকদম্ব ইত্যাদি গাছ, আর-এক রকম কাঁটাওয়ালা বাঁশ (Dendrocalamus strictus) প্রায় সব জায়গায়ই আছে।

বনজ গাছ

ভারতবর্ষে বনজ লতাগুল্ম বাদ দিয়েও বনজ বড়ো গাছই অন্তত আড়াই হাজার রকম আছে। তাদের প্রত্যেকের বিবরণ এখানে দেওয়া অবশ্য অসম্ভব। মানুষের ব্যবহার উপযোগী গাছের মধ্যে অল্পসংখ্যক কতকগুলির বিবরণ এখানে দেওয়া হবে। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে বনজ গাছের মধ্যে কোন্ গাছের কোন্ অংশ কি বিশেষ কাজের উপযোগী এ সম্বন্ধে আমরা এখনো সামান্যই জানি। তাছাড়া মানুষের প্রয়োজনও সব সময়ে এক হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আগে বাড়ির কড়ি, বরগা, দরজা, জানালা, এমন কি দেওয়াল, মেঝে পর্যন্ত সবই কাঠের তৈয়ারি হত কিন্তু লোহা আর কন্‌ক্রিটের ব্যবহার বেশী হওয়ায় এ সব কাজে কাঠের ব্যবহার কমে গিয়েছে। অন্য দিকে দেশলাই, কাগজ, প্যাকিংকেস, পেন্সিল ইত্যাদির জন্য অনেক রকমে কাঠের প্রয়োজন অন্তত দশ গুণ বেড়েছে আর ক্রমাগতই বাড়ছে।

বনজ বহু জিনিস মানুষের অসংখ্য প্রয়োজনে লাগে। এদের মধ্যে প্রধান জিনিস কাঠ। এ ছাড়া বাঁশ, ঘাস, বেত, গাছের ছাল, ফল, ফুল, পাতা, গাছের তেল, রজন, আঁশ, তুলা, রবার, খাবার ফল ইত্যাদি উদ্ভিদজ আর রেশম, গালা, হাতির দাঁত, পশুচর্ম, হাতি, মধু, শিকারের পশু ইত্যাদি পশুজ অনেক জিনিস মানুষের প্রয়োজনে লাগে।

১। কাঠ

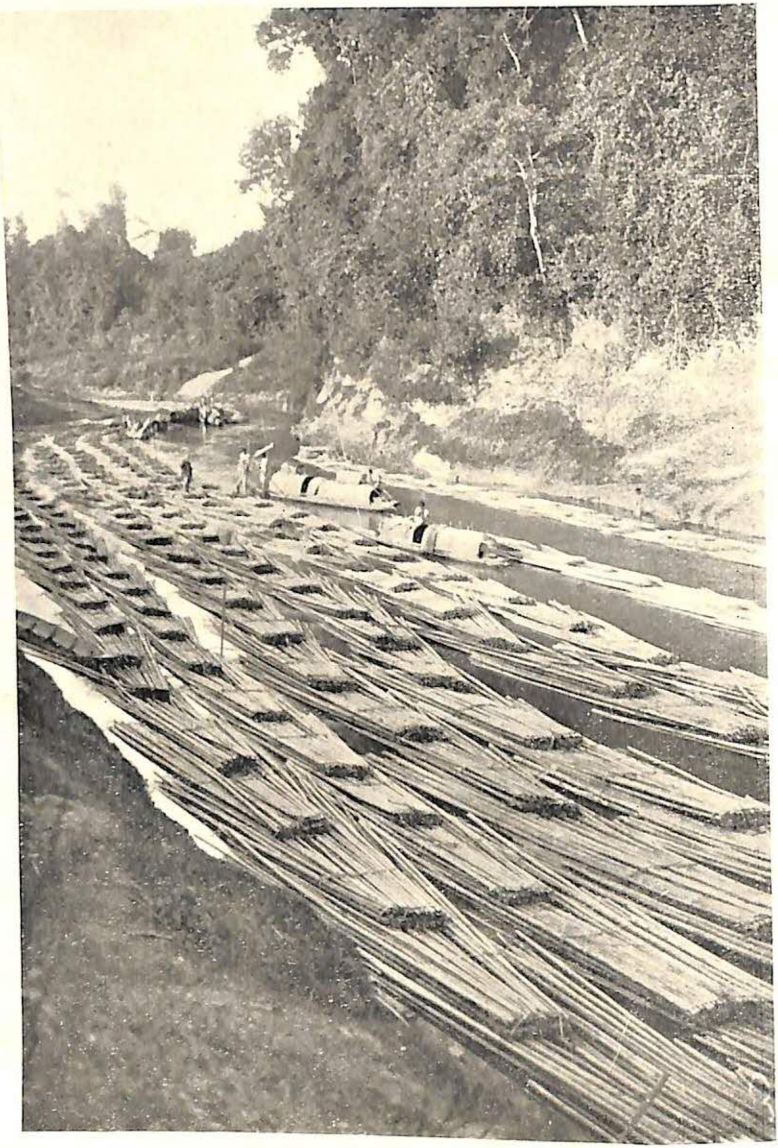
কাঠের ব্যবহার নিম্নলিখিত কয় ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হবে।

(১) বাহাদুরী কাঠ (২) কাগজের জন্যে মণ্ড, (৩) করাতের গুঁড়া, (৪) জ্বালানী কাঠ ও কয়লা, (৫) উর্ধ্বপাতিত ও ক্ষারিত জিনিস (distillation products)।



সুঁদরী অরণ্য। কয়রাগাঙ। সুন্দরবন

জে. আর. পি. জেণ্ট গৃহীত ফটোগ্রাফ



বাঁশের চালি। মইনিমুখ। পার্বত্য চট্টগ্রাম

আর. এস. পিয়ার্সন গৃহীত ফটোগ্রাফ

(১) বাহাদুরী কাঠ

"বাহাদুরী কাঠ" কথাটা এখানে এই অর্থে ব্যবহার করব যে সেই সব কাঠ যা করাত দিয়ে কেটে ব্যবহার হয়। বাহাদুরী কাঠ মানুষের যে যে ব্যবহারে আসে তার কতকগুলি নিচে লেখা হল :

(ক) বাড়ির দরজা, জানালা, কড়ি, বরগা, দেওয়াল, মেঝে, পুলের পাটাই, রেলিং।

(খ) ঘরের খুঁটি, বেড়ার খুঁটি, নরম মাটিতে বাড়ি করবার জন্যে পাইল, টেলিগ্রামের খুঁটি, খনির খুঁটি, রাস্তায় কাঠের ইট (এদেশে এর ব্যবহার এখনও বেশী হয়নি—লণ্ডন, প্যারিসের বেশীর ভাগ রাস্তাই কাঠের), রেলওয়ে স্লীপার।

(গ) কুয়ার জলের নীচের লাইনিং (দেওয়াল), খালের মধ্যের দরজা, নদীর বাঁধ রক্ষা করবার কাঠ।

(ঘ) তেলের ও আখের ঘানি, ঢেঁকি, চরকা, তাঁত।

(ঙ) জাহাজ, নৌকা, মাস্তুল, দাঁড়, হাল, ডিঙি, ডোঙা, (যে নৌকা একটা আস্ত গাছ খুদে তৈয়ারি হয়)।

(চ) ছুতারের কাজ—আসবাব।

(ছ) গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রেল গাড়ির বহু অংশ।

(জ) পিপে, বাঁক, বর্শার হাতল, ধনুক, তীর, ছিপ।

(ঝ) কোঁদাই আর খোদাই করা জিনিস। বাটি, বোয়েম্, থালা, চামচ, খাট ও চেয়ারের পায়া, খেলনা, শৌখিন বাক্স, ছড়ি, মূর্তি-গঠন।

(ঞ) ছবি—উড্‌কাট্‌ ছাপবার (কাঠ)।

(ট) পেন্সিল, কলম।

(ঠ) দেশলাই বাক্স ও কাঠি।

(ড) প্যাকিং কেস (বিশেষত চা, চুরুট অভ্র ইত্যাদির জন্য)।

(ঢ) চাষের কাজের জন্য—লাঙল, মই, জল সেঁচবার ডোঙা।

(ণ) বন্দুকের হাতল, অস্ত্রের হাতল, হারমোনিয়ম ইত্যাদি বাজনা, চিরুনি, ব্রুসের পিঠ, ক্রিকেট হকি টেনিস্ খেলবার সরঞ্জাম, ফুটরুল, হুকার নলচে।

যে সব গাছে বাহাদুরী কাঠ উৎপন্ন হয় তার কতকগুলির বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। এ সব গাছের স্কন্ধ (প্রথম ডাল পর্যন্ত কাণ্ড) যত উঁচু আর সমবর্তুল হয় ততই ভালো। তা ছাড়া কাণ্ড বা গুঁড়ি যত মোটা হয় ততই বেশী বাহাদুরী কাঠ পাওয়া যায়। কোন্ গাছ কত মোটা তা বোঝাবার জন্যে সাধারণত মাটি থেকে ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচুতে কাণ্ডের পরিধি মাপা হয়। একে বলে বুক সমান উঁচুতে বেড় (girth at breast height)। নীচের তালিকায় একে "বুঃ বেঃ" বলা হবে, আর মাপ ফুটে দেওয়া হবে। সব গাছ সব জায়গায় সমান উঁচু হয় না। এক তো বয়সভেদে গাছের আকারের তফাত হয়। তা ছাড়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যেও গাছের আকারের তারতম্য হয়। (পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলিয়ে প্রয়োজন মতো আকারের গাছ তৈয়ারি করা অরণ্যকৃষ্টির প্রধান কাজ।) নীচের তালিকায় উঁচু আর "বুঃ বেঃ"র যে অঙ্ক দেওয়া হল এটা প্রত্যেক জাতীয় গাছ ভালো অবস্থায় কতটা পর্যন্ত বাড়ে তার একটা আন্দাজ মাত্র। এক জাতীয় গাছ হলেও তার প্রত্যেকের প্রত্যেক অংশের রাসায়নিক (chemical) ও পদার্থবিজ্ঞানীয় (physical) গঠন ঠিক এক হয় না। তাহলেও প্রত্যেক কাঠের ওজন মোটামুটি বোঝবার জন্যে প্রতি কিউবিক ফুটে সার কাঠের ওজন গড়ে কতটা তাই দেওয়া হয়েছে। যেমন—(বাবলা কাঠের) "৫৪ পাঃ"। এর মানে হচ্ছে যে বাবলা কাঠের সারের গড়ে প্রত্যেক কিউবিক ফুটের ওজন ৫৪ পাউণ্ড। (প্রতি কিউবিক ফুট জলের ওজন ৬২½ পাউণ্ড; কোনো জিনিস এর চেয়ে ভারী হলে জলে ডুবে যায়।)

গাছের তালিকায় প্রথমে বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হল আর এই বৈজ্ঞানিক নামের আদ্যাক্ষর ধরে তালিকা সাজানো হল। এই নামের নীচে দেশীয় নাম

দেওয়া হল। যেখানে বাংলা নাম আছে সেখানে প্রথমে বাংলা নামই দেওয়া হল। তারপরে অন্য ২।১টা প্রদেশে প্রচলিত নাম দেওয়া হল। ভারতের প্রত্যেক স্থানে যত রকম নাম আছে সব দেওয়ার জায়গা এ বইতে নেই। তবু এক-একটা গাছের ভারতে কত রকম নাম আছে তার আন্দাজ দেবার জন্যে আমগাছের বেলায় নানা প্রদেশের নাম দিলাম।

"সংস্থানে"র জায়গায় যেখানে "ভারতের সর্বত্র" বলা হয়েছে সেখানে বুঝতে হবে যে ওই গাছ সব প্রদেশেই পাওয়া যায়, তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে যেমন সুন্দরবন বা হিমালয়ের বেশী উঁচুতে নয়।

Abies Webbiana, *Lindl.*

ইংরেজী—Silver fir। নেপালী—গোব্‌রে সল্‌লা।

সংস্থান—হিমালয়ে ৭০০০ থেকে ১৪০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত শুধু এই গাছের অনেক অরণ্য আছে।

বিবরণ—সরল গোত্রের স্বজাতিসঙ্গপ্রিয়,—চিরহরিৎ গাছ। সূচলো পাতার তলার অংশ রূপালী রঙের। গাছ সোজা। কাণ্ড সমবর্তুল ২১৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু। বুঃ বেঃ ২৩ ফুট।

কাঠের গুণ—সাদা রঙের নরম কাঠ।

ব্যবহার—প্যাকিং কেস ও হালকা টেবিল, চেয়ার, দরজা, জানলার উপযোগী। আমরা যাকে কেরাসিন কাঠের বাক্স বলি সে বাক্সের কাঠ এই ধরনের। উত্তর ইউরোপ ও আমেরিকায় এই জাতীয় কাঠে কাগজ তৈয়ারি হয়।

Acacia arabica, *Willd.*

বাংলা—বাবলা। হিন্দি—বাবুল।

সংস্থান—সিন্ধু, রাজপুতানা, গুজরাটের অরণ্যে। অন্যত্র খোলা জায়গায়, বিশেষত শুকনো বালি জমিতে আপনা আপনি হয়।

বিবরণ—মাঝারি আকারের প্রায় চিরহরিৎ গাছ। গুঁড়ি ছোটো। বিটপ (crown) ছত্রাকার। ডালে পাতায় কাঁটা।

কাঠের গুন—অসার কাঠ বেশী। রং সাদাটে। সার কাঠ লালচে সাদা, কাটার পর ক্রমশ লালচে ব্রাউন। শক্ত। ৪৪ পাঃ। খুব টেঁকসই। ভালো পালিশ হয়।

ব্যবহার—ঘরের খুঁটি। কড়ি। চৌকাঠ। লাঙল। হাতল। গাড়ি। খুব ভালো জ্বালানী কাঠ। উত্তর-পশ্চিমের রেলওয়ে ইঞ্জিনে জ্বালানো হয়।

Acacia Catechu, *Willd.*

ভারতীয়—খয়ের।

সংস্থান—ভারতের প্রায় সর্বত্র। ৩০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত। পাহাড়ে দেশে নদীর চড়ায় অনেক পাওয়া যায়।

বিবরণ—মাঝারি আকারের পত্রমোচী গাছ। ডালে কাঁটা আছে। গাছ দেখতে অনেকটা বাবলার মতো। বড়ো গাছ (বুঃ বেঃ ৩ ফুটের বেশী) বেশী পাওয়া যায় না।

কাঠের গুন—খুব শক্ত ও ভারী। ৬৬ পাঃ। বাইরের অসার কাঠ হলদে সাদা—ভিতরের সার কাঠ টকটকে লাল। চমৎকার পালিশ হয়। কাঠ পোকায় খায় না। অনেকদিন টেঁকে।

ব্যবহার—ঘরের খুঁটির পক্ষে ভালো। গরুর গাড়ির চাকা, ধুরো, বম্ ইত্যাদি। জাঁতা। ঢেঁকি। খাটের পায়া। অস্ত্রের হাতল। লাঙল। সমুদ্রের নোনা জলে টেঁকসই, সেইজন্য জেটিতে ব্যবহার হয়। ভালো জ্বালানী কাঠ। ভালো কাঠকয়লা হয়।

অন্যান্য—কাঠ জ্বাল দিয়ে তার ক্বাথ থেকে খয়ের তৈরি হয়।

Adina cordifolia, *Hook.*

বাংলা—কেলি কদম্ব। হিন্দি—হল্‌দু। নেপালী—করম্।

সংস্থান—ভারতের প্রায় সর্বত্র—পত্রমোচী অরণ্যে।

বিবরণ—উপযুক্ত মাটি ও আবহাওয়ায় খুব বড়ো আকারের গাছ হয়। উঁচু ১৩৮ ফুট পর্যন্ত। বুঃ রেঃ ১৭ ফুট।

কাঠের গুণ—কাটবার পরেই হলদে রং ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়। দানা বেশ সমান। কোঁদাই কাজ (carving) সহজে হয়। খুব শক্ত নয়। খুব ভারী নয়। ৪৫ পাউণ্ড।

ব্যবহার—কাঠ দেখতে ভালো আর সহজেই কাজ করা যায়। আসবাব (টেবিল আলমারি প্রভৃতি)। চিরুনি। চেয়ার টেবিলের গোল পায়া। বাটি। তেল বা ঘি রাখবার বোয়েম। ঢোলক ইত্যাদি।

Artocarpus Chaplasha, *Roxb.*

বাংলা—চাপালিশ। নেপালী—লাটর।

সংস্থান—নেপালের পূর্বে হিমালয় তরাই, আসাম, চট্টগ্রাম।

বিবরণ—বড়ো পত্রমোচী গাছ। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ আছে। উঁচু ১৫০ ফুট। বুঃ বেঃ ১৫ ফুট।

কাঠের গুণ—রং হলদে বা ব্রাউন। দেখতে ভালো। মাঝারি রকম শক্ত ও টেঁকসই। হাল্কা। ৩৪ পাঃ।

ব্যবহার—চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগে খুব বড়ো বড়ো গাছ পাওয়া যেত। সেখানে ৫০।৬০ ফুট লম্বা কাণ্ডের মধ্যের কাঠ কেটে ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা ডোঙা তৈরি করা হয়। কোঁদাই আর খোদাই কাজ। খুব ভালো আসবাব। ঘরের কড়ি, বরগা। পাটাইয়ের তক্তা।

Bombax malabaricum, *DC.*

বাংলা—শিমুল।

সংস্থান—ভারতের সর্বত্র। বিশেষত পত্রমোচী অরণ্যে। ৫০০০ ফুট পর্যন্ত।

বিবরণ—খুব বড়ো পত্রমোচী গাছ। উঁচু ১৩০ ফুট। বুঃ বেঃ ১২ ফুটের গাছ দুষ্প্রাপ্য নয়। ডালগুলি আবর্ত; অর্থাৎ কাণ্ডের সমান সমান উঁচুতে

চারিদিকে ৪।৫টা করে ডাল হয়। ডালগুলি আবার চক্রবালীয় (horizontal)। সেইজন্য অনেক দূর থেকে গাছ চেনা যায়। লাল বড়ো বড়ো ফুল। ছোটো গাছের গায় কাঁটা থাকে।

কাঠের গুণ— রং কাটবার সময় সাদা, পরে ময়লা। খুব নরম। টেঁকসই নয়। সার কাঠ নেই। ২৩ পাঃ।

ব্যবহার—প্যাকিং কেস। দেশলাই। খেলনা। চামচ। ঢোলক। ছোরার খাপ। কাঠের মণ্ড থেকে কাগজ ইত্যাদি।

অন্যান্য—তুলায় গদী, বালিশ। বিচি থেকে তেল।

Cassia fistula, *Linn.*

বাংলা—সোনালু। বাঁদরলাঠি। হিন্দি—আমাল্‌টাস্‌। নেপালী—রাজবিরিচ্‌। সংস্কৃত—রাজবৃক্ষ, কর্ণিকার।

সংস্থান—ভারতের সর্বত্র। ৪০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত।

বিবরণ—সুন্দর, পত্রমোচী গাছ। সোনালি হলদে ফুলের বল্লরী লম্বা লম্বা ঝুলে থাকে। ফল গোল ১ হাত দেড় হাত লম্বা লাঠির মতো। কলিকাতার রাস্তায় অনেক লাগানো হয়েছে।

কাঠের গুণ—লাল বা ইটের রং। খুব শক্ত। কাজ করা কঠিন, ভেঙে যায়। ৬০ পাঃ। ভারী কাজের উপযুক্ত।

ব্যবহার—ঘরের খুঁটি, কড়ি, বরগা। গরুর গাড়ির চাকা। ঢেঁকি। নৌকা। লাঙল। ভালো জ্বালানী কাঠ আর কয়লা।

Castanopsis hystrix, *A. DC.*
Castanopsis tribuloides. *A. DC.*

নেপালী—কাটুস্‌। ইংরেজী—Chestnut.

সংস্থান—পূর্ব-হিমালয়। ৯০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত। দার্জিলিং। সিকিম। ভুটান। আসাম। খাসিয়া পাহাড়।

বিবরণ—চিরহরিৎ প্রকাণ্ড গাছ। উঁচু ১২০ ফুট। বুঃ বেঃ ১৫ ফুট বা আরো বেশী। বিটপ (Crown) বিস্তৃত।

কাঠের গুণ—হলদে ব্রাউন রং। শক্ত। মাঝারি রকম টেঁকসই। ৪৬ পাঃ।

ব্যবহার—দার্জিলিং অঞ্চলে ঘরের খুঁটি, কড়ি, বরগা, পাটাইয়ের তক্তার জন্য খুব চাহিদা আছে। ভালো জ্বালানী কাঠ হয় না। কয়লা ভালো হয়।

Casuarina equisetifolia, *Forst.*

বাংলা—ঝাউ।

সংস্থান—স্বাভাবিক ভাবে চট্টগ্রামের সমুদ্রতটে পাওয়া যায়। অন্য জায়গায় শহরের রাস্তার ধারে আর বাড়ির কম্পাউণ্ডে অনেক রোপা হয়েছে। এই গাছের অনেক বড়ো বড়ো অরণ্য বোম্বাই, মালাবার অঞ্চলের সমুদ্রতটে আর পূর্বে তাঞ্জোর অঞ্চলে রোপা হয়েছে। বেলেমাটিতে ভালো হয়।

বিবরণ—খুব লম্বা সোজা গাছ। শীঘ্র বাড়ে। উঁচু ১৩০ ফুট বা আরো বেশী।

কাঠের গুণ—কাঠ ব্রাউন রঙের। সহজে ফাটে। খুব শক্ত। সহজে কাজ করা যায় না। মাঝারি রকম ভারী। ৫০ পাঃ।

ব্যবহার—জ্বালানী কাঠ।

Cedrela Toona, *Roxb.*
Cedrela microcarpa, *C. DC.*

বাংলা—পেঁউ। হিন্দি—টুন। চট্টগ্রাম—সুরুজবেদ।

সংস্থান—হিমালয়ে পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত। তরাই। সমতল। আসাম। চট্টগ্রাম। অনেক জায়গায় রাস্তার ধারে রোপা হয়েছে।

বিবরণ—নিম্বগোত্রের খুব প্রকাণ্ড পত্রমোচী গাছ। দেখতে ভালো, অনেকটা

মহানিমের মতো। একটা বড়ো গাছ থেকে ৫০০ কিউবিক ফুট বাহাদুরী কাঠ বেরিয়েছিল। বুঃ বেঃ ২০ ফুট।

কাঠের গুণ—রং লালচে থেকে ঘোর লাল। চকচকে পালিশ হয়; পালিশে তেল একটু বেশী লাগে। শীঘ্র শুকায়, কিন্তু ভিজলে আয়তনে বাড়ে। ভিতরের কাজে টেঁকসই; সহজে পোকায় কাটে না। ৩৫ পাঃ।

ব্যবহার—ভারতের সর্বত্র আসবাবের জন্য ব্যবহার হয়। খোদাই করা বাক্স। মাদ্রাজে চুরুটের বাক্স তৈরি হয়। দার্জিলিঙে ভিতরের ছাদ (ceiling) হয়।

Cedrus libani var Deodara, *Bar.*

দেশীয়—দেওদার।

সংস্থান—পশ্চিম হিমালয়। কুমায়ুনের পূর্বে হয় না। পশ্চিমে আফগানিস্থান পর্যন্ত। ৬০০০ থেকে ৮০০০ ফুট পর্যন্ত। সরল গোত্রের প্রকাণ্ড উঁচু, চমৎকার স্বজাতিসঙ্গপ্রিয় গাছ।

বিবরণ—দেওদার অরণ্য দেখতে অতি চমৎকার ও মহান। মনে হয় এই অরণ্যের ছায়ায় বসে মুনি-ঋষিরা বেদ রচনা করেছিলেন। ২৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। বুঃ বেঃ ২০।২১ ফুট পর্যন্ত।

কাঠের গুণ—হলদে ব্রাউন রং। ধুপের গন্ধ। মাঝারি রকম শক্ত। টেঁকসই। কাঠে এক রকম তেল আছে। পালিশ মন্দ হয় না। ৩৫ পাঃ।

ব্যবহার—প্রধানত রেলওয়ে স্লীপার। পুলের কাঠ। ঘরবাড়ির সমস্ত অংশ ও অন্যান্য সাধারণ কাজ।

Dalbergia sissoo, *Roxb.*

বাংলা—সিসু। হিন্দি সিসম্।

সংস্থান—হিমালয়ের পাদদেশে সর্বত্র। সিন্ধু থেকে আসাম পর্যন্ত। বিশেষত পার্বত্য নদীর চড়ায়, খয়ের গাছের সঙ্গে। অন্যত্র মানুষের রোপা।

বিবরণ—মাঝারি থেকে বড়ো আকারের পত্রমোচী সুন্দর গাছ। পাতা অনেকটা অশ্বত্থ গাছের মতো।

কাঠের গুণ—সার কাঠের রং ব্রাউন, ঘোর রং আর ফিকে রঙের লাইন পর পর সাজানো। শক্ত। দানাগুলি খুব ঘন। টেঁকসই, না বেঁকে এবং না ফেটে সহজেই শুকায়। কাঠ দেখতে বেশ ভালো।

ব্যবহার—প্রধানত আসবাব ও গাড়ির চাকা। তেলের ঘানি। আখ-মাড়াইয়ের কল। খুঁটি। ক্রিকেট খেলবার স্টাম্প। খোদাই কাজ। নৌকা। ভালো জ্বালানী কাঠ। ভালো কয়লা।

Diospyros Ebenum, *Koenig.*

দেশীয়—আবলুশ।

সংস্থান—লঙ্কা দ্বীপ। বেরার। খান্দেশ। কাডাপা। কারনুল।

বিবরণ—গাবজাতীয় গাছ। লঙ্কায় বেশ বড়ো হয়। অন্যত্র গাছ ছোটো ও দুষ্প্রাপ্য।

কাঠের গুণ—সারের রং কালো। এ রকম সম্পূর্ণ কালো রঙের কাঠ পৃথিবীতে আর নেই। ভারী ৭০ পাঃ। ভালো পালিশ হয়।

ব্যবহার—খোদাই কাজ। খেলনা। ছড়ি। পিয়ানোর চাবি। বুরুশের পিঠ ইত্যাদি শৌখিন কাজ।

Diospyros melanoxylon, *Roxb.*

Diospyros tomentosa, *Roxb.*

বাংলা—গাব। দাক্ষিণাত্য—তেন্দু। সংস্কৃত—তিন্দুক।

সংস্থান—মধ্য-দাক্ষিণাত্য। উড়িষ্যা। বাংলায় রোপা হয়।

বিবরণ—পত্রমোচী গাছ, মাঝারি আকারের।

কাঠের গুণ— অসার কাঠ হলদে ও ব্রাউন। সার কাঠ কালো, মধ্যে মধ্যে

বেগুনে রঙের লাইন আছে। শক্ত। কাজ করা কঠিন। সহজে ফেটে যায়। ভালো পালিশ হয়। সহজে শুকায় না। ৬০ পাঃ।

ব্যবহার—আসল আবলুশের বদলে ব্যবহার হয়। তবে এ কাঠ আসল আবলুশের মতো সম্পূর্ণ কালো রঙের নয়।

অন্যান্য—নৌকার কাঠের ফাঁক বোজাবার জন্যে এর আঠা ব্যবহার হয়।

Dipterocarpus turbinatus, *Gaertn. f.*

বাংলা—গর্জন।

সংস্থান—চট্টগ্রাম, কাছাড়।

বিবরণ—প্রকাণ্ড চিরহরিৎ গাছ। প্রায়ই ২০০ ফুট উঁচু। বুঃ বেঃ ১২ ফুট।

কাঠের গুণ—লাল ব্রাউন রং। মাঝারি রকম শক্ত। খুব টেঁকসই নয়। ৫০ পাঃ।

ব্যবহার—ঘরবাড়ির ছাদ ছাড়া আর সমস্ত অংশ। সাধারণ কাজ। চট্টগ্রামে ডোঙা হয়, কিন্তু ডোঙা জলে ভর্তি হয়ে গেলে ডুবে যায়।

অন্যান্য—এ গাছ থেকে এক রকম তেল বার করা হয়, সে তেল বাঁশে ও অন্যান্য কাঠে বার্নিশের কাজে লাগে।

Eugenia jambolana, *Lam.*

বাংলা—জাম। হিন্দি—জামুন।

সংস্থান—ভারতের সর্বত্র। ২০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত। বিশেষত আর্দ্র জায়গায়। প্রায়ই রোপা (cultivated) হয়।

বিবরণ—মাঝারি বা বড়ো আকারের চিরহরিৎ গাছ।

কাঠের গুণ—কাঠ লালচে রঙের। মাঝারি রকম শক্ত ও টেঁকসই।

ব্যবহার—ঘরের খুঁটি, কড়ি, বরগা। গাড়ির চাকা। কাঁচা কুয়ার দেওয়াল।

Gmelina arborea, *Roxb.*

বাংলা—গাম্ভারী। হিন্দি—গামারী।

সংস্থান—ভারতের সর্বত্র।

কাঠের গুণ—রং হলদে, সাদা বা ঈষৎ লাল। সহজে কাজ করা যায়। টেঁকসই, সমানভাবে শুকায়। দেখতে সুশ্রী। শক্ত অথচ হাল্কা। ৩৬ পাঃ।

বিবরণ—বড়ো পত্রমোচী গাছ। ১০০ ফুট উঁচু। বুঃ বেঃ ১৫ ফুট।

ব্যবহার—তক্তা। বাক্স। প্যাকিং বাক্স। আসবাবের জন্য বিশেষ উপযোগী। পালকি। গাড়ি। নৌকা। কোঁদাইয়ের কাজ। চিরুনি। খেলনা। ঢোলক।

Hardwickia binata, *Roxb.*

হিন্দি—আন্জান।

সংস্থান—মধ্য-ভারত।

বিবরণ—বড়ো, সুশ্রী গাছ। স্বজাতিসঙ্গপ্রিয়। উঁচু প্রায় ১০০ ফুট। বুঃ বেঃ ৮।১০ ফুট।

কাঠের গুণ—রং গভীর লাল, ব্রাউন, মধ্যে মধ্যে কালো ডোরা। খুব শক্ত, radially অর্থাৎ আঁশের এড়োএড়ি ভাবে কাটা বা চেরা খুব কঠিন, আঁশগুলি পাকানো বলে এরকম কাটা কঠিন হয়। খুব ভারী। প্রতি কিউবিক ফুটের ওজন ১ মন অর্থাৎ সেগুন কাঠের দ্বিগুণ। এত ভারী কাঠ এদেশে আর নেই। খুব টেঁকসই।

ব্যবহার—খুঁটি, কড়ি, বরগা। পুলের কাঠ। কারখানার কলের পিঁড়ি ও কলের অন্য অংশ। গাড়ির চাকা। তাঁত। করাত চালানো কঠিন বলে তক্তা ব্যবহার কম হয়।

Heritiera minor, *Roxb.*

দেশীয়—সুঁদরী।

সংস্থান—সুন্দরবন (খুলনা ও বরিশাল), সুন্দরবনের ২৪ পরগণা অংশে নেই।

বিবরণ—মাঝারি আকারের চিরহরিৎ গাছ। ৬০ ফুটের চেয়ে বেশী উঁচু বা ৬ ফুটের চেয়ে বড়ো বুঃ বেঃ গাছ আজকাল দেখা যায় না। বেশীর ভাগ গাছেরই বুঃ বেঃ এর চেয়ে কম।

কাঠের গুণ—রং গভীর লাল। খুব শক্ত। দানা ঘন। খুব টেঁকসই। ৭০ পাঃ। খুব ভারসহ। Elastic অর্থাৎ খুব ভারেও সহজে ভাঙে না—বেঁকে গিয়ে আবার ভার সরালেই সোজা হয়ে যায়। এই সব গুণের জন্যে এ কাঠ অনেক কাজে উপযোগী। কিন্তু গাছ বড়ো হয় না বলে বেশী ব্যবহার নেই।

ব্যবহার—নৌকার সব অংশ। কড়ি, বরগা। পাটাইয়ের তক্তা, খুঁটি, মাস্তুল। গাড়ির চাকা। জ্বালানী কাঠ।

Juglans regia, *Linn.*

বাংলা—আখরোট। নেপালী—ওখর। সংস্কৃত—অক্ষোড়।

সংস্থান—হিমালয়। দার্জিলিং জেলায় এখন দুষ্প্রাপ্য। কালিম্পঙের অরণ্যে এখনো কিছু কিছু পাওয়া যায়। কাশ্মীর কুলু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হাজারায় যথেষ্ট আছে।

বিবরণ—খুব বড়ো পত্রমোচী গাছ। দেখতে সুশ্রী। পাতা সুগন্ধী। পশ্চিম হিমালয়ে ভালো ফল হয়। দার্জিলিঙের গাছের ফলে শাঁস অল্পই থাকে। উঁচু ১০০ ফুট পর্যন্ত। বুঃ বেঃ ১০ ফুট।

কাঠের গুণ—রং ধূসর ব্রাউন। মধ্যে মধ্যে গভীর রঙের ডোরা কাটা। দেখতে অতি চমৎকার। মাঝারি রকম শক্ত। কাজ করা সহজ। ভালো পালিশ হয়। শুকালে বেশী ভারী নয়। ৪০ পাঃ।

ব্যবহার—আসবাবের জন্য বেশী ব্যবহার হয়। দামী কাঠ। কোঁদাই-খোদাইয়ের জন্য উপযোগী। বন্দুকের হাতল। চরকা। শৌখিন খোদাই-করা থালা বাক্স টুল কৌটা ইত্যাদি।

Lagerstroemia flos-reginae, *Retz.*

বাংলা—জারুল। আসাম—আজহার।

সংস্থান—আসাম। চট্টগ্রাম।

বিবরণ—খুব বড়ো পত্রমোচী গাছ। বড়ো বড়ো লালচে বেগুনী রঙের ফুল হয়। সেইজন্যে অনেক সময়ে রাস্তার ধারে লাগানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকাণ্ড আকারের গাছ। (বুঃ বেঃ ১২-১৪ ফুট) এখনো পাওয়া যায়। অনেক গাছ ডোঙা করে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

কাঠের গুণ—খুব ভালো কাঠ। সামান্য লালচে সাদা রং। শক্ত। টেঁকসই। ভালো পালিশ হয়। সহজে কাজ করা যায়। জলের নীচেও ভালো থাকে। ৪০ পাঃ।

ব্যবহার—বাড়িঘর। গরুর গাড়ি। পুলের কাঠ। নৌকার সব অংশ। মাস্তুল। বৈঠা। আসবাব।

Mangifera indica, *Linn.*

বাংলা, হিন্দি—আম। কোল্—উলি। সাঁওতাল—উলু। মারাঠা—আম্বি। কানারিজ—মাভু। তেলেগু—মামিদি। তামিল—মআ, মান্‌গাস্। গোন্দ—মার্কা। উড়িয়া—আম্বো। মঘি—চারাটপাং। মালায়ালাম—মাভু। গারো—জেগাচু।

সংস্থান—ভারতের সর্বত্র রোপিত। সিকিম ও আসামে স্বতঃজাত।

বিবরণ—বড়ো চিরহরিৎ গাছ। অরণ্যে স্বতঃজাত অবস্থায় খুব লম্বা গাছ হয়। আর স্কন্ধ (প্রথম ডাল পর্যন্ত কাণ্ড) ৫০।৬০ ফুট হয়। সাধারণত স্কন্ধ ছোটো আর বিটপ (crown) বড়ো হয়।

কাঠের গুণ—রং ধূসর থেকে গভীর ব্রাউন। মধ্যে মধ্যে ঘোর রঙের ডোরা। শক্ত। টেঁকসই। জলের নীচে ভালো থাকে। তক্তা ভালো শুকায়। দেখতে সুশ্রী নয় (খসখসে)। আঁশ মোচড়ানো। ৪২ পাঃ।

ব্যবহার—সর্বত্র পাওয়া যায়। এইজন্যে যথেষ্ট ব্যবহার হয়। কড়ি, বরগা। প্যাকিংকেস। ডোঙা ইত্যাদি।

Mesua ferrea, *Linn.*

বাংলা—নাগেশ্বর, নাগকেশর। আসাম—নাহর।

সংস্থান—জলপাইগুড়ি। আসাম। চট্টগ্রাম। মালাবার। দার্জিলিঙের পূর্বপ্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে অনেক আছে।

বিবরণ—বড়ো, চিরহরিৎ, স্বজাতিসঙ্গপ্রিয়, সুশ্রী গাছ। বৌদ্ধ মন্দিরে ও অন্যত্র প্রায়ই রোপা হয়। ফুল সাদা সুগন্ধি। পাতা পল্লবে টকটকে লাল থাকে, ক্রমশ চক্‌চকে সবুজ রঙের হয়। এ গাছ রাস্তার দুধারে লাগালে চমৎকার দেখায়।

কাঠের গুণ—রং ঘোর লাল। খুব শক্ত। খুব ভারী। ৭০ পাঃ। টেঁকসই। এক-রকম রজন আছে। ভালো শুকায় না। তক্তা সহজে বেঁকে আর ফেটে যায়।

ব্যবহার—রেলওয়ে স্লীপার। কড়ি, বরগা। পুলের কাঠ। নদীর জেটী (jetty)। অস্ত্রের হাতল। ইত্যাদি।

Michelia Champaca, *Linn.*

বাংলা—চাঁপা। সংস্কৃত—চম্পক।

সংস্থান—পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশে ৩০০০ পর্যন্ত। আসাম। পশ্চিমঘাট। দাক্ষিণাত্য। সর্বত্র রোপিত।

বিবরণ—উঁচু সুশ্রী চিরহরিৎ গাছ। গুঁড়ি গোল, লম্বা, সোজা হয়। জল-পাইগুড়ি অঞ্চলে ১১০ ফুট উঁচু ১৬ ফুট পর্যন্ত বুঃ বেঃ ভালো গাছ পাওয়া যায়। হলদে সুগন্ধ ফুল।

কাঠের গুণ—অসার কাঠ বেশী নয়। তার রং সাদা। সার কাঠ ফিকে হলদে ব্রাউন। চকচকে, সহজে মসৃণ করা যায়। নরম। আঁশ সোজা। ৩৪ পাঃ। টেঁকসই। কাঠ দেখতে ভালো।

ব্যবহার—মূল্যবান কাঠ। ভালো আসবাব। ঘরের খুঁটি। তক্তা। ছুতারের সাধারণ কাজ প্রভৃতি।

Michelia excelsa, *BI.*

নেপালী—সফেদ্ চাঁপ।

সংস্থান—পূর্ব-হিমালয়। ৬০০০ ফুট থেকে ৮০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে দার্জিলিং ও খাসিয়া পাহাড়ে।

বিবরণ—উঁচু পত্রমোচী গাছ। স্কন্ধ খুব উঁচু। সাদা বড়ো বড়ো সুগন্ধি ফুল। লম্বায় ১০০ থেকে ১২০ ফুট। বুঃ বেঃ ১০ ফুটের গাছ দুষ্প্রাপ্য নয়। এর চেয়ে বড়ো গাছও পাওয়া যায় কিন্তু প্রায়ই তার মধ্যে পচা হয়।

কাঠের গুণ—সার কাঠের রং সবুজ হলদে থেকে ব্রাউন। আঁশ সোজা। মাঝারি রকম শক্ত। ৩৫ পাঃ। টেঁকসই। করাত দিয়ে কাটা সহজ। মসৃণ হয়। ভালো পালিশ হয়।

ব্যবহার—ভালো কাঠ। দার্জিলিং জেলায় প্রচুর চাহিদা। দরজা, জানালা। আসবাব। দেওয়াল। জুট মিলের ববিন (bobbin)।

Mimusops Elengi, *Linn.*

বাংলা—বকুল। মালয়ালম্—এলেন্জি।

সংস্থান—দক্ষিণ ভারত, বিশেষত পশ্চিম অংশ। অন্যত্র রোপিত।

বিবরণ—বড়ো চিরহরিৎ গাছ। সুগন্ধ ফুলের জন্য সর্বত্র রোপিত।

কাঠের গুণ—গভীর লাল রঙের। খুব শক্ত। টেঁকসই। মসৃণ। সহজে কাজ করা যায় না। ৬০ পাঃ।

ব্যবহার—কড়ি। খুঁটি। ঢেঁকি।

অন্যান্য—সুগন্ধ ফুল থেকে এসেন্স হয়। ফল খাওয়া যায়। ফলের বিচি থেকে একরকম তেল হয়, সে তেল ওষুধে, প্রদীপে ও রান্নায় ব্যবহার হয়। গাছের ছালও ওষুধে ব্যবহার হয়।

Odina Wodier, *Roxb.*

বাংলা—জিওল। চট্টগ্রাম—ভাদি। সংস্কৃত—জিঙ্গিনী।

সংস্থান—ভারতের সর্বত্র।

বিবরণ—পত্রমোচী গাছ। আর্দ্র জায়গায় গাছ বড়ো হয়। প্রায় ৫০।৬০ ফুট উঁচু কাণ্ড আর ৭।৮ ফুট বুঃ বেঃ।

কাঠের গুণ—অসার অংশ ধূসর সাদা। সার খুব কম, ইটের রং। মাঝারি রকম শক্ত। মাঝারি রকম টেঁকসই। ৫০ পাঃ।

ব্যবহার—কাঠ খুব ভালো না হলেও সর্বত্র পাওয়া যায় বলে ব্যবহার বেশী। তক্তা। দেশলাইয়ের কাঠি ভালো হয়। অন্য কাঠ না পাওয়া গেলে সবরকম কাঠের কাজেই লাগে।

অন্যান্য—এ গাছের আঠা অনেক কাজে ব্যবহার হয়—যেমন চুনকাম করবার চুনের গোলার সঙ্গে, কাগজ মসৃণ করতে, কাপড় ছাপাতে, কাগজ জুড়তে, ওষুধে।

Ougeinia dalbergioides, *Benth.*

হিন্দি—সন্দন। সংস্কৃত—তিনিশ, স্যন্দন্। "তিনিশেস্যন্দনো নেমী রথদ্রুঃ" ইত্যমরঃ।

সংস্থান—মধ্য-ভারত। উত্তর-ভারতে হিমালয়ের তরাইয়ে সর্বত্র। নেপালের পূর্বে দুষ্প্রাপ্য।

বিবরণ—মাঝারি আকারের পত্রমোচী গাছ। কোথাও কোথাও স্বজাতি-সঙ্গপ্রিয়। গুঁড়ি প্রায়ই সোজা হয় না।

কাঠের গুণ—রং ধূসর থেকে ধূসর ব্রাউন, এক কাঠেই নানা রং থাকে। দানা ঘন। শক্ত। চিমসে। খুব ভারসহ। Elastic অর্থাৎ "মচকায় কিন্তু ভাঙে না।" ৬০ পাঃ

ব্যবহার—গাড়ির চাকার জন্যে খুব উপযোগী। সেকালে নিশ্চয়ই এ কাঠে রথের চাকা হত তাই সংস্কৃত নাম স্যন্দন। পালকির দণ্ড। নৌকার দাঁড়। কুড়ালের হাতল। গাড়ির জোয়াল। লাঙল। চরকা।

Pinus longifolia, *Roxb.*

হিন্দি—চির্, চিল্। সংস্কৃত—সরল।

সংস্থান—পশ্চিম-হিমালয়ে ১৫০০ থেকে ৭০০০ ফুট উঁচুতে। দার্জিলিঙের অরণ্যে অল্প কয়েকটি গাছ ১৫ বৎসর আগেও ছিল, এখন নাই। সিকিম।

বিবরণ—খুব লম্বা প্রকাণ্ড গাছ, স্বজাতিসঙ্গপ্রিয়। প্রায় সম্পূর্ণ পত্রমোচী। প্রত্যেক গুচ্ছে তিনটা করে পাতা। পাতাগুলি সূচের মতো, ৯″ থেকে ১২″ লম্বা। গাছের প্রত্যেক অংশে রেজিন থাকে বলে সরলের অরণ্য বেশ সুগন্ধ।

কাঠের গুণ—রং গোলাপী। মধ্যে মধ্যে রজনবাহী শিরগুলা লাল রঙের। শক্ত। ভারসহ। টেঁকসই। ৪০ পাঃ।

ব্যবহার—পাহাড়ে বাড়িঘর। প্যাকিং কেস। নৌকা। রেলওয়ে স্লীপার।

অন্যান্য—এই গাছের রেজিন (ধূনা) থেকে তার্পিন তৈল বার হয়। সরল গাছে রেজিন থাকায় এতে সহজেই আগুন লাগে। অনেক সরল গাছ সাধারণত একসঙ্গে থাকে, এইজন্যে সরল গাছের অরণ্যে আগুন লাগলে নিবানো দুঃসাধ্য। কালিদাস বলেন যে নিজেদের মধ্যে গা ঘষাঘষি করে এদের অরণ্যে আগুন লেগে যায় :—

তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দাবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ
রাপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদোহ্য ত্তমানাম্ ॥—মেঘদূতম্ ।১।৫৩

পাথর গড়িয়ে পড়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কিংবা বজ্রপাতের ফলেও সরল গাছের অরণ্যে আগুন লাগার কথা শোনা যায়।

Pinus Khasya, *Royle.*

বাংলা—সরল। খাসিয়া—তিংসা।

সংস্থান—খাসিয়া পাহাড়।

বিবরণ—লম্বা চিরহরিৎ স্বজাতিসঙ্গপ্রিয় গাছ। লম্বায় ১০০ ফুট। বুঃ বেঃ ১০ ফুট। অনেকটা চির্‌পাইনের মতো, কিন্তু পাতা লম্বায় কিছু ছোটো।

কাঠের গুণ—রং ব্রাউন থেকে লাল। মাঝারি রকম শক্ত। বার্ষিক বৃত্ত (annual rings) স্পষ্ট।

ব্যবহার—বাড়িঘর ইত্যাদি। নির্যাস থেকে তাপিন তেল।

Pterocarpus marsupium, *Roxb.*

হিন্দি—বিজাশাল। পিয়াশাল। সংস্কৃত—"পীতশালকে সর্জকাহসন বন্ধুক পুষ্প প্রিয়ক জীবকাঃ" ইত্যমরঃ।

সংস্থান—মধ্য ও দক্ষিণ ভারত। উড়িষ্যা।

বিবরণ—বড়ো পত্রমোচী সুশ্রী গাছ। বুঃ বেঃ ৯।১০ ফুট পর্যন্ত হয়। উঁচু ৭০।৮০ ফুট।

কাঠের গুণ—সার কাঠের রং হলদে ধূসর ব্রাউন। খুব শক্ত। ঘন দানা। সহজে কাজ করা যায়। ভালো পালিশ হয়। টেঁকসই। ভালো শুকায়। ৫৫ পাঃ।

ব্যবহার—চৌকাঠ। খুঁটি। তক্তা। লাঙল। অস্ত্রের হাতল। গাড়ি। আসবাব হয়, কিন্তু জল লাগলে হলদে রং বার হয়। গাড়ির চাকা। ঢোলক।

অন্যান্য—গাছ থেকে লাল নির্যাস বার হয়।

Pterocarpus santalinus, *Linn. f.*

দেশীয়—রক্তচন্দন।

সংস্থান—মাদ্রাজ, কাজপা জিলা।

বিবরণ—ছোটো সুশ্রী গাছ। বিটপ ছত্রাকার। ২৫ ফুট উঁচু।

কাঠের গুণ—অসার কাঠ সাদা। সার কাঠ গভীর লাল। কখনো কখনো প্রায় কালো, কিন্তু লাল আভা থাকেই। খুব শক্ত। টেঁকসই। ভারী। ৭০ পাঃ।

ব্যবহার—লাল রঙের জন্য ব্যবহার হয়। গন্ধ নেই। ভালো খোদাই হয়। শৌখিন, সম্পন্ন লোকে বারান্দায় খোদাই করা থামের জন্যে ব্যবহার করেন।

Quercus lamellosa, *Sm.*

লেপচা—বুক। নেপালী—বুজরাট। ইংরেজী—এক প্রকার ওক্।

সংস্থান—পূর্ব-হিমালয়, নেপাল থেকে ডাফলা পাহাড়। ৬০০০ ফুট থেকে ৯০০০ ফুট উঁচুতে।

বিবরণ—খুব বড়ো চিরহরিৎ গাছ। দার্জিলিং পাহাড়ে কখনো কখনো ১২০ ফুট উঁচু আর বুঃ বেঃ ৩০ ফুট পাওয়া যায়। ১২।১৪ ফুটের বেশী বুঃ বেঃ-র গাছ বেশীর ভাগই ফাঁপা। বিটপ বিস্তীর্ণ।

কাঠের গুণ—সার কাঠ ধূসর ব্রাউন। খুব শক্ত। ৫৯ পাঃ। তক্তা ফেটে যায়।

ব্যবহার—খুঁটি। কড়ি, বরগা। খুব ভালো জালানী কাঠ। ভালো কাঠকয়লা হয়।

Santalum album, *Linn.*

দেশীয়—চন্দন।

সংস্থান—দক্ষিণ-ভারত, বিশেষত মহীশূর, কইম্বাটুর, নীলগিরি, ধারওয়ার, কুর্গ।

বিবরণ—ছোটো চিরহরিৎ গাছ।

কাঠের গুণ—অসার কাঠ সাদা, গন্ধ নেই। সার কাঠ হলদে ব্রাউন, সুগন্ধ। শক্ত ও খুব ঘন দানা। কেটে খুব মসৃণ করা যায়। ফাটে না। ৬০ পাঃ। কাঠে সুগন্ধি তেল আছে। পৃথিবীতে যত কাঠ আছে, তার মধ্যে চন্দন কাঠ সব চেয়ে দামী।

ব্যবহার—প্রধানত শৌখিন কাজ। খুব ভালো খোদাই হয়। খোদাই করা বাক্স, ছবির ফ্রেম, ছড়ি, হাতল, কলম ইত্যাদি। শবদাহ। করাতের গুঁড়ায় কাপড় সুগন্ধ করা হয়। কাঠের টুকরা থেকে চন্দনতেল বার করা হয়।

Schleichera trijuga, *Willd.*

বাংলা—কোশাম ; কুসুম। সংস্কৃত—কোশাম্র।

সংস্থান—প্রায় সর্বত্র। বাংলাদেশে নেই।

বিবরণ—বড়ো পত্রমোচী গাছ। বিটপ খুব বিস্তৃত। নতুন পাতা চকচকে লাল।

কাঠের গুণ—সার কাঠ লাল ব্রাউন। খুব শক্ত। চিম্‌সে। টেঁকসই। ভারী। ৭।৮ পাঃ।

ব্যবহার—তেল ও আখের ঘানি। গাড়ির ধুরা ও চাকা। ঢেঁকি। উদুখল। জাঁতা। খোদাইয়ের কাজ। কাঠকয়লা।

অন্যান্য—বীজ থেকে জ্বালানী তেল আর Macassar oil হয়। এর ডালে সবচেয়ে ভালো গালা জন্মায়।

Shorea robusta, *Gaertn. f.*

বাংলা, হিন্দি—সাল। নেপালী—শকুয়া। সংস্কৃত—সাল, সর্জ, কার্য, অশ্বপর্ণক ইত্যাদি।

সংস্থান—হিমালয়ের দক্ষিণে পাঞ্জাবের কাংরা থেকে আসামের দারাং পর্যন্ত।

ঢাকা। মধ্যভারত থেকে গোদাবরী পর্যন্ত। সবচেয়ে বড়ো সালগাছ নেপাল, বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় জন্মায়।

বিবরণ—বড়ো সোজা গুঁড়িবিশিষ্ট, প্রায় সম্পূর্ণ পত্রমোচী, স্বজাতিসঙ্গপ্রিয়। ১০০।১৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু আর ২০।২৫ ফুট বুঃ বেঃ গাছ নেপালে পাওয়া যায়। সাধারণত ৮০ থেকে ১০০ ফুট উঁচু আর ৮।৯ ফুট বুঃ বেঃ-র বেশী হয় না। ৬০।৭০ ফুট পর্যন্ত লম্বা স্কন্ধ দুর্লভ নয়।

কাঠের গুণ—অসার কাঠ কম। রং সাদা। সার কাঠ খয়ের রঙের। খুব শক্ত। খুব টেঁকসই। কাটবার পর ক্রমশ প্রায় কালো হয়! খুব ভারসহ। আঁশ মোচড়ানো। কাঠ ভালো মসৃণ হয় না। ভালো শুকায় না। এ রকম টেঁকসই কাঠ পৃথিবীতে বেশী নাই। পাটলিপুত্রে অশোকের যে রাজপ্রাসাদ ছিল তার সালকাঠের অংশ এখনো পাওয়া গেছে। ৫৫ পাঃ।

ব্যবহার—প্রধানত রেলওয়ে স্লীপার। কড়ি, বরগা। তক্তা। গাড়ির চাকা। মাস্তুল, দাঁড়। নৌকা। পিপে ইত্যাদি। ছোটো গাছে ঘরের খুঁটি হয়। ভালো জ্বালানী কাঠ ও কাঠকয়লা হয়।

অন্যান্য—নির্যাসে ধুনা হয়।

Tectona grandis, *Linn. f.*

বাংলা—সেগুন। গোণ্ডি—টেকা। তামিল—টেক্। ইংরেজী—teak.

সংস্থান—দাক্ষিণাত্য, বিশেষত নর্মদা ও গোদাবরীর দক্ষিণে। অন্যত্র রোপিত। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও চট্টগ্রামের অরণ্যে অনেক রোপা হয়েছে। (ব্রহ্মদেশ)।

বিবরণ—বড়ো পত্রমোচী গাছ।

কাঠের গুণ—সার কাঠ প্রথম কাটবার সময় সোনালি হলদে। পরে ব্রাউন রঙের হয়। কোনো কোনো গাছে গভীর রঙের ডোরা কাটা থাকে। মাঝারি রকম শক্ত। কাঠে এক রকম তেল আছে যার জন্যে খুব টেঁকসই হয়। ৪৫ পাঃ।

ব্যবহার—সেগুন কাঠকে দুনিয়ার সেরা কাঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাঠ দেখতে চমৎকার। সহজে কাজ করা যায়। মসৃণ হয়। ভালো পালিশ হয়। এর চেয়ে টেঁকসই গাছ আর নেই। লোকে বলে এ কাঠ চিরকাল টেঁকে। সমুদ্রের teredo কীট এ কাঠ খায় না। সেইজন্য ও অন্যান্য গুণে জাহাজের কাজে এ কাঠ সর্বোৎকৃষ্ট। বর্মার শ্রেষ্ঠ সেগুন ইংরেজদের নৌ-বিভাগের জন্য রিসার্ভ করা হত। আগে রেলওয়ে স্লীপার প্রচুর হত। কিন্তু আজকাল মহার্ঘ বলে এ কাঠ স্লীপারের জন্যে ব্যবহার হয় না। বাড়ি-ঘরের সমস্ত অংশ। রেলগাড়ি ও অন্যান্য গাড়ি। শ্রেষ্ঠ আসবাব। পিপে। খোদাইয়ের কাজ ইত্যাদি।

অন্যান্য—পাতা খস্‌খসে বলে অল্প অল্প পালিশের কাজে লাগানো যায়। কচি পাতায় লাল রং আছে।

Terminalia myriocarpa, *H. & M.*

নেপালী—পানিসাজ। আসাম—হলক।

সংস্থান—পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশে ও ৫০০০ ফুট পর্যন্ত।

বিবরণ—প্রকাণ্ড চিরহরিৎ গাছ বুঃ বেঃ ২০।২৫ ফুট পর্যন্ত। দুষ্প্রাপ্য নয়। আর্দ্র জায়গায় ভালো হয়। এইজন্যে নেপালী নাম। উপরের পাতাগুলি প্রায়ই লালচে থাকে।

কাঠের গুণ—রং ফিকে ব্রাউন থেকে ঘোর ব্রাউন। লাইন কাটা কাটা দাগ। চক্‌চকে। মসৃণ। ৪০ পাঃ। ভালো শুকায়। ছায়ায় টেঁকসই। সহজে কাটা যায়।

ব্যবহার—প্লাই কাঠের উপযোগী। ভালো আসবাব। ঘরের দেওয়াল। মেঝে। সাধারণ ছুতারের কাজ।

Terminalia tomentosa, *W*. and *A*.

বাংলা—সাঁই, আসন, পিয়াশাল। হিন্দি—শাল। নেপালী—পাখাসাজ।
সংস্থান—ভারতের সর্বত্র ৪০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত।
বিবরণ—বড়ো পত্রমোচী গাছ। ৮০ ফুট থেকে ১০০ ফুট উঁচু আর বুঃ বেঃ ৮ থেকে ১০ ফুট প্রায়ই পাওয়া যায়। দার্জিলিং জেলায় পাহাড়ের দাঁড়ায় (ridge) না হয়ে দুই 'পাথায়' বা slope-এ হয় এইজন্য পাখাসাজ।
কাঠের গুণ—সার কাঠ ব্রাউন থেকে গভীর ব্রাউন, কাটার অনেক পরে ধূসর হয়ে যায়। পালিশ করলে চমৎকার ডোরা কাটা দেখতে হয়। খুব শক্ত, সেইজন্য করাতীরা কাটতে চায় না। ভালো শুকানো কঠিন, ফেটে যায়। ৬৭ পাঃ।
ব্যবহার—ঘরের কড়ি, বরগা, চৌকাঠ। লাঙল, জোয়াল। গাড়ির দণ্ড, ধুরা। ঘানি। কলে শুকিয়ে আর কেটে নিতে পারলে এ কাঠের তক্তা দেওয়ালে panelling-এর জন্য খুব চমৎকার।

(২) কাগজের জন্য মণ্ড

বিদেশে থেকে যত কাগজ এদেশে আমদানি হয় সে সবই কাঠের মণ্ড থেকে তৈরি হয়। ভারতবর্ষে এখনো কাঠের মণ্ডের কাগজ তৈরি হয় না। এদেশে কলের কাগজ যা তৈরি হয় তা সবই বাঁশের বা ঘাসের মণ্ড থেকে। মণ্ডের উপযোগী গাছ, যথা—Abies Webbiana, প্রচুর আছে।

(৩) করাতের গুঁড়া

জিনিসপত্র প্যাক্ করার জন্যে, বিস্ফোরক জিনিসের সঙ্গে মেশাতে, সিরকা ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে করাতের গুঁড়া ব্যবহার হতে পারে।

(৪) জ্বালানী কাঠ ও কয়লা

জ্বালানী কাঠের জন্যে প্রায় সব কাঠই ব্যবহার হয়। কতকগুলি কাঠে বেশী ছাই হয় বা তাপ কম হয় বা সহজে শুকায় না, সেগুলি জ্বালানীর জন্যে ভালো নয়। সাধারণত যে সব কাঠ বেশী ভারি আর শক্ত তাতে জ্বালানী কাঠ আর কাঠকয়লা ভালো হয়। সেই রকম কাঠের আগুনের তাপও বেশী।

বাড়িতে রান্নার জন্যে ব্যবহার করতে পাথুরে কয়লা আর কাঠের চেয়ে কাঠকয়লা অনেক স্থবিধা। এতে ধোঁয়া হয় না। সহজে জ্বালানো, নেবানো যায়। আর হাল্‌কা কাঠকয়লার ব্যবহার আমাদের দেশে কম। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশের মধ্যভাগে কাঠকয়লা করবার মতো যথেষ্ট অরণ্য নেই। দার্জিলিং জেলায় লোকে অনেক কাঠকয়লা ব্যবহার করে থাকে। আজকাল মোটর গাড়ির ইন্ধনের জন্য প্রচুর কাঠকয়লা দরকার হয়েছে। সেইজন্য দার্জিলিং জেলা ছাড়া চট্টগ্রাম ও স্থন্দরবনের অরণ্য থেকেও কাঠকয়লা উৎপন্ন হচ্ছে।

(৫) উর্ধ্বপাতিত ও ক্ষারিত জিনিস

এর মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে চন্দনের তেল। এ ছাড়া দেওদার কাঠ থেকে এক রকম তেল হয় যা পাঁচড়া আর বাতের জন্য ব্যবহার হয়।

পাইনের আর সেগুনের কাঠ জাল দিয়ে কিছু কিছু আল্‌কাতরা বার হয়। অগুরু কাঠ থেকে আতর হয়। এ গাছ আসামে পাওয়া যায়। খয়ের গাছের কাঠ কুচি কুচি করে জলে সিদ্ধ করে তার ক্বাথ থেকে তিন রকম জিনিস তৈরি হয়—(১) কাচ্—এতে চট আর মাছ ধরার জাল রং করা হয়। (২) খয়ের—পানের সঙ্গে খাবার জন্যে। (৩) কীরসাল্—এক রকম ঔষধ।

২। বাঁশ

ভারতবর্ষের অরণ্যে প্রায় ১০০ রকম বাঁশ জন্মে। এখানে বাংলাদেশের অরণ্যে যেগুলি পাওয়া যায়, তার কতকগুলির বিবরণ দেব।

জলপাইগুড়ি জেলায় ও দার্জিলিং জেলায় ৩০০০ ফুট পর্যন্ত অরণ্যের প্রধান বাঁশ নেপালী ভাষায় "তামা বাঁশ" (Dendrocalamus Hamiltonii) ৮০ ফুট লম্বা আর বেড়ে ২ ফুট পর্যন্ত হয়। প্রতি ঝাড়ে বাঁশগুলি প্রায় নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। কেটে বার করা একটু শক্ত। তল্‌দা বাঁশ (Bambusa Tulda) বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রায়ই রোপিত হয়। এ বাঁশ বেশ শক্ত আর কেটে বার করা সহজ। বাংলাদেশের অরণ্যে এ বাঁশ বোধ হয় জন্মে না। যা আছে সবই বোধ হয় রোপিত। তিন-চার হাজার ফুট পাহাড় পর্যন্ত আর এক রকম বাঁশ পাওয়া যায় তার নাম 'মাল' (B. nutans) বাঁশ। এও তল্‌দা বাঁশের চেয়েও সহজে কাটা যায় আর ঘরের খুঁটি ইত্যাদি কাজের উপযুক্ত।

দার্জিলিং জেলায় ৬০০০ ফুটের উপরে বড়ো বাঁশ পাওয়া যায় না। এক রকম ছোটো বাঁশ পাওয়া যায়, তার নাম নেপালী ভাষায় 'মালিং' বাঁশ (Arundinaria racemosa)। এর ঝাড় হয় না। এগুলি উঁচুতে ১২।১৬ ফুট হয়। ৩´´-৪´´ ইঞ্চি গোলাই হয়। এতে চাটাই ঝুড়ি ইত্যাদি হয়।

সুন্দরবনে বাঁশ নেই।

চট্টগ্রামে প্রধান বাঁশ 'মুলি' (Melocanna bambusoides), এর ঝাড় হয় না। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বাঁশ মাটির তলার শিকড় থেকে উৎপন্ন হয়। এ বাঁশ খুব সোজা, কাঁটাবিহীন, ৬০-৭০ ফুট উঁচু আর বেড়ে ৯।১০ ইঞ্চি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু স্থান জুড়ে অরণ্যের মধ্যে উঁচু গাছের ফাঁকে ফাঁকে এ বাঁশের ঘন বন আছে। চট্টগ্রামের অনেক পার্বত্য জাতি তাদের বাড়ির সমস্ত অংশ (ছাদ পর্যন্ত), খাট, চৌকি, জলের পাত্র, থালা, হুকা, ধামা ইত্যাদি এই বাঁশে তৈরি করে।

চট্টগ্রামের অরণ্য থেকে লক্ষ লক্ষ বাঁশের চালি (Raft) তৈরি হয়ে নদীতে ভেসে চট্টগ্রাম শহরে পৌছায় ও সেখান থেকে অন্যত্র চালান যায়।

বাঁশের মণ্ড থেকেও কাগজ তৈরি হয়। তবে বাংলাদেশের অরণ্যের বাঁশ থেকে কাগজের মণ্ড হয় না, তার প্রধান কারণ কলিকাতা থেকে অরণ্যের দূরত্ব।

৩। বেত

বেতবন বাংলা ও আসামেই বেশী আছে। উত্তর-বাংলায় অরণ্যে যে বেত সাধারণত পাওয়া যায় তা মালয় বেতের মতো ভালো নয়। চেয়ারের সীট্ ও পিঠ তাতে হয় না। তবে এ বেত চা-বাগানের প্রয়োজনীয় ঝুড়ি ইত্যাদির উপযুক্ত। চট্টগ্রামের অরণ্যে অনেক রকম বেত পাওয়া যায়। তার মধ্যে ক্যারাক বেত প্রসিদ্ধ। এই বেত লম্বায় অনেক সময়ে ১৫০।২০০ ফুট পর্যন্ত পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত বাঁশের চালি বাঁধবার জন্যে এ বেত খুব উপযোগী।

৪। ঘাস

অরণ্যের মধ্যে অনেক জায়গায় বড়ো বড়ো ঘাস (Savannah) অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। ভারতের সর্বত্র এ রকম সাভানা অরণ্য আছে। ঘাস প্রধানত তিন রকমে ব্যবহার হয় :

(১) কাগজের মণ্ড—প্রধানত মুন্জ্ ঘাস (Saccharum arundinaceum) ও ভাবর বা সাবাই ঘাস (Ischoemum angustifolium)।

(২) ঘর ছাইবার ঘাস বা খড়।

(৩) রোশা ঘাস (Cymbopogon Martini) ও লেমন ঘাস (Lemon grass, Cymbopogon citratus) থেকে উর্ধ্বপাতন করে এসেন্স বার করা হয়। এ ঘাস বাংলাদেশেও আছে কিন্তু মধ্যপ্রদেশেই বেশী আর সেখানেই এসেন্স তৈরি করবার কারখানা আছে।

গাছের অন্যান্য অংশ

(ক) আঁশ ও তুলা

(১) কাণ্ড থেকে—অরণ্যে অনেক ছোটো ছোটো গুল্ম আছে যার ছাল থেকে কম বা বেশি মূল্যবান আঁশ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে—সুন্দরবনে জলের ধারে অনেক জায়গায় কেওয়ার বন আছে। এর পাতায় শক্ত আঁশ হয়। দার্জিলিং জেলার অরণ্যে সিসূনু নামক একরকম বিছুটি অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। তার ছালের আঁশ পাটের চেয়েও দামী। এ রকম আরো অনেক গুল্মের ছালে আঁশ হয়।

কুম্ভি (Careya arborea), বোহারী (Cordia Myxa), উদাল (Sterculia villosa), কাঞ্চন (Bauhinia racemosa) ইত্যাদি গাছের, Spatholobus Roxburghii (দেব্‌রে লারা), Bauhinia Vahlii (শিয়ালী লতা) ইত্যাদি লতার ছাল থেকে শক্ত দড়ি হয়।

হিমালয়ে ৫০০০ থেকে ৬০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে কাগতী (Daphne cannabina) নামে এক রকম গুল্ম বা ছোটো গাছ জন্মে। এর ছাল থেকে নেপালে হাতে তৈরি কাগজ হয়।

(২) ফল থেকে—যে সব ফলের তুলা আমাদের কাজে লাগে তার মধ্যে শিমুলই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বনজ।

(খ) তেল নিষ্কাশনের উপযোগী বীজ

কোসাম (Schleichera trijuga) ও মহুয়ার (Bassia latifolia) তেল প্রদীপের ও রান্নার কাজে চলে। সাবান তৈরির কাজেও লাগে। Bassia butyracea (নেপালী "চিউরী")র বীজের তেল ঘিয়ের মতো ব্যবহার হয়।

"চাল মুগরা"র তেল কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্মরোগের ঔষধ। এ গাছ (Taraktogenos Kurzii) চট্টগ্রামের অরণ্যে জন্মে। "করঞ্জ" গাছ

(Pongamia glabra) সব অরণ্যেই (স্থন্দরবনেও) পাওয়া যায়। এর তেলে ঔষধ ও জ্বালানী হয়।

(গ) ট্যান ও রঞ্জক

ট্যান—চামড়া শোধন করার ঔষধের নাম ট্যান (Tan)। বাবলা (Acacia arabica) ও গরানের (Ceriops Candolleana) ছাল ট্যানের কাজে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া সাল, সোনালু, কুল, জিওল, পিয়াশাল, জাম, আমলকী ইত্যাদি বনজ গাছের ছালও এ কাজের উপযুক্ত। বনজ ট্যান ফলের মধ্যে হরিতকী, বহেড়া ও আমলকী উল্লেখযোগ্য। খয়েরকাঠ জ্বাল দিয়ে যে কাচ নামক জিনিস বার করা হয়, তাও ট্যান করবার কাজে লাগে।

রঞ্জক—পিয়াশাল, আখরোট, শাল ইত্যাদি গাছের ছাল ব্রাউন রঙ করবার রঞ্জকের জন্য ব্যবহার হয়। দার্জিলিঙে অরণ্যে (ও বসতিতে) প্রচুর পরিমাণে মনজিট্ (সংস্কৃত মঞ্জিষ্ঠা) (Rubia cordifolia) নামক একরকম লতা পাওয়া যায়। এর শিকড় ও অন্যান্য অংশ থেকে পাকা লাল রঙের রঞ্জক পাওয়া যায়। নানাজাতীয় "খোল্‌মে" "খারানি" ইত্যাদি (Symplocos Spp) গাছের পাতায় হল্‌দে রঞ্জক হয়। কাঁঠালকাঠের রঞ্জক থেকে সন্ন্যাসীর গেরুয়া কাপড় রং হয়।

চিকরাসী গাছের ফুলে লাল বা হল্‌দে রঞ্জক, চাঁপা ও টুনের ফুলে হল্‌দে রঞ্জক, পলাশের ফুলে হল্‌দে ও কমলা রঙের রঞ্জক হয়। কামেলা গাছের (Mallotus philippinensis) ফলের উপর এক রকম লাল গুঁড়ো থাকে। এই গুঁড়ো সংগ্রহ করে রেশমের উপর লাগালে চকচকে কমলা রং হয়।

এ ছাড়া অসংখ্য রকম রঞ্জক অরণ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপের রাসায়নিক রঞ্জক এ সব বনজ রঞ্জকের বাজার নষ্ট করেছে।

(ঘ) ক্ষারিত ও উর্ধ্বপাতিত বনজ

তেল, আলকাতরা ইত্যাদি

অল্প বাতাসে কাঠ পোড়ালে দু রকম জিনিস উৎপন্ন হয়: (১) কাঠকয়লা, (২) পাইরোলিগনিয়াস্ অ্যাসিড (Pyroligneous acid)। এই শেষোক্ত জিনিস থেকে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম, আইওডোফর্ম্, মিথাইলীন, ফরম্যালিন, ক্রিয়োসোট্, পিচ্, আলকাতরা ইত্যাদি অনেক বস্তু পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে কিছু কিছু কাঠকয়লা তৈরি হয়। কিন্তু এদেশে এখ্না উপরে লিখিত অন্য সমস্ত জিনিসের কোনোটাই এই প্রথায় প্রস্তুত হয় না।

ভারতবর্ষের বনজ থেকে উৎপন্ন এ বিভাগে উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে: (১) চন্দন তেল, (২) অগুরু তেল, (৩) পাইন ও সেগুন কাঠের আলকাতরা।

(ঙ) আঠা, রজন, কাঠের তেল

ছাল থেকে—বাব্লা, ধাওরা, উদাল, বিজাসাল, পলাশ, জিওল ইত্যাদি অসংখ্য গাছে আঠা আছে। আঠা প্রধানত জিনিস জুড়তে, মিষ্টান্নে (লজেঞ্চুস জাতীয়) দিতে, কাপড় রং করতে, কাগজ মসৃণ করতে ও ওষুধে লাগে। সালের রজন, সলাই গাছের (Boswellia serrata) রজন ধুনায় ব্যবহার হয়।

কাঠ থেকে—চট্টগ্রামে গর্জন গাছ থেকে একরকম তেল বার করা হয়। এর নাম গর্জন তেল। এ তেল পচা কাঠের সঙ্গে মিশিয়ে মশাল করা যায়। তাছাড়া কাঠ ও বাঁশের বার্নিশ করতে আর ঔষধে এ তেল ব্যবহার হয়।

পশ্চিম হিমালয়ে পাইনগাছ থেকে একরকম রেজিন বার হয়। সে জিনিসটা উর্ধ্বপাতন করলে (১) তার্পিন তেল পাওয়া যায়। আর যা পড়ে

থাকে তার নাম (২) রজন (rosin বা colophony)। তার্পিন তেল প্রধানত বার্নিশে মেশাতে আর ঔষধে লাগে।

(চ) রবার

খুব ভালো রবার গাছ ভারতবর্ষের অরণ্যে জন্মে না। তবে অনেক রকম গাছ ও লতা আছে যার থেকে কিছু কিছু রবার পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এক রকম বটগাছ যা পূর্ব-হিমালয়ে (দার্জিলিং অঞ্চলে) পাওয়া যায় (Ficus elastica)। এ ছাড়া ছাতিম গাছ ও নানা রকম লতায় কিছু রবার আছে।

(ছ) ঔষধ, মশলা, বিষ ইত্যাদি

ভারতের বনজ গাছ গাছড়া থেকে অসংখ্য রকম ঔষধ বিষ ইত্যাদি তৈরি করা যায়। তার সব বিবরণ এ বইতে দেওয়া অসম্ভব। অল্প কতকগুলির নাম দেওয়া হল। এগুলির সবই বাংলাদেশের অরণ্যে পাওয়া যায়।

কুরচি—Holarrhena antidysenterica (আমাশয়ের ওষুধ)।

বাসক—Adhatoda Vasica (জ্বর, কাশির ওষুধ)।

হরিনা—Vitex peduncularis (ব্ল্যাক ওয়াটার জ্বরের ওষুধ)।

চিরেতা—Swertia Chiretta (টনিক)।

পিপ্পল—Piper longum (কাশির ওষুধ)।

দারচিনি—Cinnamomum zeylanicum.

সোনালু—Cassia Fistula (ফল থেকে জোলাপ)।

কুঁচ—Abrus precatorius—এক রকম লতার বীজ, এতে বিষ আছে। স্বর্ণকারের ওজনরূপেও ব্যবহৃত হয়।

বিখ্ (নেপালী)—Aconitum ferox। এতে ষ্ট্রিক্‌নিন আছে। এ ছাড়া উড়িষ্যার অরণ্যে (Strychnos Nux-Vomica) কুচিলা গাছের বিচি থেকে ষ্ট্রিক্‌নিন তৈয়ারি হয়।

Podophyllum emodi এক রকম গুল্ম পশ্চিম-হিমালয়ে প্রচুর জন্মে, তার থেকেও ঔষধ হয়।

(জ) বনজ খাদ্য

বনজ ফল ফুলের মধ্যে চালতা (Dillenia indica) ফল, মহুয়া (Bassia latifolia) ফুল, নানা জাতীয় Berberis নামক কাঁটা গাছের ফল, আমড়া (Spondias Mangifera), কুল (Zizyphus spp), র‍্যাস্‌বেরী বা আসেলু (Rubus spp) স্ট্রবেরী, গাব (Diospyros spp), তুঁত (Morus spp), ডুমুর (Ficus spp), আমলকী (Phyllanthus Emblica), আখরোট (Juglans regia) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অনেক রকম সুখাদ্য আলু (Yam) (Dioscorea spp) অরণ্যে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের গোলপাতার ফল খেতে অনেকটা তালশাঁসের মতো। বাঁশের বীজ সাধারণত ২৫।৩০ বছর পরে পরে ফলে। বাঁশের বীজ সাধারণত অনেকটা ধানের মতো হয়। দুভিক্ষের সময় এই রকম কোনো বাঁশের বীজ হলে কাজে লাগে।

(ঝ) চুপড়ি, টুকরি ইত্যাদি

প্রায় সব রকম বাঁশে ও বেতে ও অনেক রকম ঘাসে টুকরি তৈরি হতে পারে। তাছাড়া কতকগুলি গাছের ডালে ও পাতায় এই কাজ হয়, যেমন—বাবলা, পলাশ, সিস্থ, তুত, বনঝাউ (Tamarix), নিসিন্দে (Vitex Negundo), গোলপাতা (Nipa fruticans), হাঁন্তাল (Phoenix sp)। শীতলপাটির গাছ পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যে জন্মে। অনেক গাছের বড়ো বড়ো পাতা ঠোঙা আর চুপড়ির লাইনিঙে লাগে, যেমন—পলাশ, গোল-পাতা, কাঞ্চন, সাল। অনেক গাছের খস্‌খসে পাতায় হাতির দাঁতের, কাঠের আর হাড়ের তৈরি জিনিস পালিশ করা যায়, যেমন নানা জাতীয় বট, সেগুন, চালতা ইত্যাদি। গোলপাতায় ঘর ছাওয়া হয়।

(ঞ) জৈবিক বনজ

অরণ্য যে শিকারের স্থান এ কথা অবশ্য বলা বাহুল্য। বাংলাদেশের অরণ্যে হাতি, গণ্ডার, বাঘ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, বন্য কুকুর, নানা জাতীয় বন্য বিড়াল, নানা জাতীয় হরিণ, গরু, বাইসন, মহিষ, সর্প, শূকর, কুক্কুট, মথুরা (pheasant), হরিয়াল ইত্যাদি আছে। অনেক পার্বত্য নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

এ সব পশুর ব্যবসা চলে না। বাজারে বিক্রয়ের দিক থেকে কয়েকটি জৈবিক বনজ উল্লেখযোগ্য—

গালা—এক রকম কীট কোনো কোনো গাছে এ জিনিস উৎপাদন করে, যেমন—কুলগাছ, কোসাম গাছ ইত্যাদি।

রেশম—কোনো কোনো অরণ্যে এর ব্যবসা আছে।

মধু ও মোম—সুন্দরবনের অরণ্যে যখন ফুল ফোটে সেই সময় অনেক লোকে মধু সংগ্রহ করতে অরণ্যে যায়।

হরিণের শিং, হাতির দাঁত, বন্য পশুর হাড় ইত্যাদি।

ঝিনুক—সুন্দরবনে জোংড়া বা এক রকম ঝিনুক সংগ্রহ হয়। এ ঝিনুক পুড়িয়ে ভালো চুন (পানে খাবার) পাওয়া যায়।

হাতি ধরা—হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্যে ও চট্টগ্রামের অরণ্যে, আসামের অরণ্যে, মহীশূরে প্রায়ই খেদা করে হাতি ধরা হয়।

উপসংহার

বাংলাদেশে সরকারী অরণ্য থেকে ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে যত বনজ উৎপন্ন হয়েছিল, তার তালিকা নীচে দেওয়া হল :

বাহাদুরী কাঠ—	১,০৩,৭৫,০০০ কিউবিক ফুট।
জ্বালানী কাঠ—	১,৭০,৫১,০০০ „
বাঁশ—	৩,৮,৩,৩৫,৪৭৮ সংখ্যা।
গোমহিষাদির খাদ্য—	৩৮,৫৩২ টাকা মূল্যের
বেত—	৬,৩০৪ মন,
	৩,১০,৮৯১ সংখ্যা, এবং
	২৯,৭৮৯ ঝুড়ি
খড়—	২৬,০১১ টাকা মূল্যের
পিপ্পল—	৭৫ টাকা মূল্যের
গোলপাতা—	৩৩৬,৪,৮৫১ সংখ্যা
হাতির দাঁত—	২৩ সংখ্যা
মধু—	১০,১৫৭ মন
মোম—	১,১২৫ মন

এই সংখ্যা দেখে কিছু বোঝা সহজ নয়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলাদেশের প্রয়োজনের তুলনায় বনজ উৎপন্ন বিশ ভাগের এক ভাগও নয়।

খনিজ ও বনজের মধ্যে এক প্রভেদ হচ্ছে যে, খনিজের নূতন সৃষ্টি মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু অরণ্যের সৃষ্টি সময়সাপেক্ষ হলেও মানুষের অসাধ্য নয়। মধ্য-বাংলায় অনেক স্থলে অরণ্য নানা কারণে প্রয়োজন। অপর পক্ষে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, প্রভৃতি জেলায় লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি "পতিত"

হয়ে আছে। আর হাজার হাজার লোক, শুধু যুদ্ধের সময়ে নয়, হয় অনাহারে ও রোগে মরছে অথবা বুভুক্ষু নরকঙ্কালের মতো কোনোক্রমে বেঁচে আছে। এই সব জেলায় মধ্যে মধ্যে অরণ্য স্থাপন করলে দেশে নানা রকম কারখানা ও কুটিরশিল্প স্থাপন হতে পারে, কৃষির জমি অনেক বেশী উর্বরা হতে পারে আর দেশ পুনরায় স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

| ১৩৫২ | ৩৭. হিন্দু সংগীত : প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন.
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

| ১৩৫৩ | ৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯. শিশুর মন : ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী
৬০. প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা : ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

| ১৩৫৪ | ৬১. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পের মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪. ভারতের অধ্যাত্মবাদ : ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫. টাকার বাজার : শ্রীঅতুল সুর
৬৬. হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

| ১৩৫৫ | ৬৭. শিক্ষাপ্রকল্প : শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
৬৮. ভারতের রাসায়নিক শিল্প ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
৬৯. দামোদর পরিকল্পনা : ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০. সাহিত্য-মীমাংসা : শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
৭১. দূরেক্ষণ : শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২ তেল আর ঘি : শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়